৫ মার্চ ২০১৫ পনেরো টাকা

কিশোর ভারতী

রহস্য গল্প স্পেশাল

১০ গল্প লিখেছেন
অনীশ দেব
সৈকত মুখোপাধ্যায়
হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত
অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী শুভমানস ঘোষ
পিনাকী মুখোপাধ্যায় অভীক মুখোপাধ্যায়
সপ্তর্ষি চ্যাটার্জী প্রদীপকুমার বিশ্বাস শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

নারায়ণ দেবনাথ নন্টে ফন্টে
জগুমামার সোনার সাগর রহস্য
৮ পৃষ্ঠা রঙিন কমিকস
বিশেষ নিবন্ধ অভিনব গল্প সিরিয়াল
খেলা ছড়া-কবিতা নিয়মিত আসর

www.foodspa.in
রসনার নতুন রূপ
আড্ডাপ্রিয়, খাদ্যরসিক বাঙালির একমাত্র তীর্থস্থান ফুডস্পা। খিদে পেলে বা না পেলেও চলে আসুন। যা খুশি খান আর মনের সুখে ঢেকুর তুলুন। লজ্জা করবেন না যেন।
foodSpa
PRIYA Cinema, 95 Rashbehari Avenue, Kolkata 700 029
Call : 9330260402 or E-mail : order@foodspa.in

কিশোর ভারতী

৪৭ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা
ফাল্গুন ১৪২১
মার্চ ২০১৫

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্মাধ্যক্ষ
চুমকি চট্টোপাধ্যায়
মুখ্যসচিব
মানস চক্রবর্তী
কার্যালয়-সচিব
অনিমেষ পাল
বিপণন-সচিব
শুভাশিস লাহিড়ী
কম্পিউটার-সচিব
বরুণ রায়
প্রচ্ছদ
সুদীপ্ত দত্ত
সম্পাদকীয় কার্যালয়
কিশোর ভারতী
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২৩৫০ ১৯৪৪
বিক্রয়কেন্দ্র
পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো,
কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২২৪১ ১১৭৫
ই-মেল patrabharati@gmail.com
ওয়েব www.bookspatrabharati.com
www.facebook.com/ Patra Bharati
*** পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন অনুমোদিত**

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা
(ডাকযোগে) ৩০০ টাকা

দাম ১৫.০০

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত
এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে মুদ্রিত।

রহস্য গল্প স্পেশাল

একমলাটে এবার দশ-দশটা রহস্য গল্প। পাঁচটি কল্পবিজ্ঞান-ভয়-রহস্য গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত। বাকি পাঁচটি লিখেছেন প্রতিষ্ঠিত লেখকরা।

আজ তোমার পরীক্ষা
অনীশ দেব ৮
রাস্তা যখন শেষ
অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী ৩৮
ওদের ভীষণ খিদে
সৈকত মুখোপাধ্যায় ১১
অদ্ভুত যাত্রী
হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত ১৪
বদ্ধপাগল
শুভমানস ঘোষ ৫৫
বন্ধু দেখা হবে
পিনাকী মুখোপাধ্যায় ২০
আতঙ্ক যখন বহুমুখী
অভীক মুখোপাধ্যায় ২৭
উলটো সময়
সপ্তর্ষি চ্যাটার্জী ২৪
পুকুরচুরি
শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ৪৭
নিশিরাতে প্লুটোর প্রভু
প্রদীপকুমার বিশ্বাস ৪৩

অভিনব গল্পের সিরিয়াল

কিছু মেঘ, কিছু কুয়াশা
জয়ন্ত দে ৫১

বিশেষ প্রতিবেদন

সঞ্জীবনী সুধা মাতিয়ে দিল ৩১

ধারাবাহিক

মিকিমোটো নেকলেস
দীপান্বিতা রায় ৪১

ছড়া-কবিতা

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ সিন্‌হা
সঞ্জয় কর্মকার ১৯

নিয়মিত আসর

আমাদের কথা ৭
তোমরা বলছ ১৮
ফান্ডা-মেন্টাল ৬২
অবিশ্বাস্য! আশ্চর্য! ৬৪

রঙিন ৮ পৃষ্ঠা কমিকস

নন্টে ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ ৪

জগুমামার রহস্য অভিযান

সোনার সাগর রহস্য
কাহিনি **ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়** ৫৮
ছবি **জুরান নাথ**

মাথা খাটানোর মুশকিল
শিবরাম চক্রবর্তী ৩৬
চিত্রনাট্য **ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়**
ছবি **সুদীপ্ত মণ্ডল**

বিশেষ নিবন্ধ

হারিয়ে যাওয়া বাদ্যযন্ত্র
রাতুল দত্ত ৩২

খেলা

স্বপ্ন দেখাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া
অভিষেক দে ৬৫

অনিবার্য কারণে রুকুসুকু এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল না

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

তুমিও খেতে পারো, কেল্টুদা। স্পেশাল চিকেন রোল। ঐতো রয়েছে।
পাশের প্যাকেটটা স্যারের জন্যে এনেছি। একটু পরে দিয়ে আসবো।
তোরা কেন খাওয়া ছেড়ে যাবি। যদি বলিস তো আমিও দিয়ে আসতে পারি।
বেশ তো, তুমিই দিয়ে এসো।
আমার হাত দিয়ে দিতে রাজি হবে ভাবিনি। তবে থোড়াই ওদের নাম করবো, বলবো আমি এনেছি খ্যিঃ-খ্যিঃ!
এবার বিক্ষোরণ ঘটবে রে নন্টে।
কেল্টু যে! হাতে ওটা কি?
স্পেশাল চিকেন রোল, আপনার জন্যে এনেছি স্যার।
বলিস কিরে স্পেশল চিকেন রোল? আমার ফেবারিট জিনিস! দে-দে।
এইযে নিন, স্যার।
অ্যাকসডেফ!
কটাং!
ক্কী-কী-হলো, স্যার?
কি হলো? হতচ্ছাড়া!
ভেতরে পাথর দিয়ে আমার জন্যে চিকেন রোল বানানো? এই নে তোর রোল।
বিক্ষোরণ চলছে, চলবে রে, নন্টে।

ই-মেল patrabharati@gmail.com

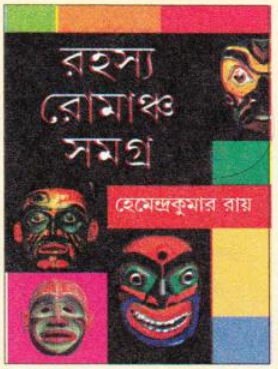

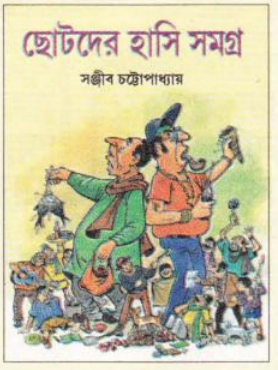

হইহই করে এসো সব্বাই! পত্র ভারতী শো-রুমে

বই কিনতে পারো www.bookspatrabharati.com দেখো www.facebook.com/ Patra Bharati

ঠিকানা 3/1 কলেজ রো, কলকাতা 700009 ফোন করলেই বই 22411175 । 94330 75550 । 98308 06799

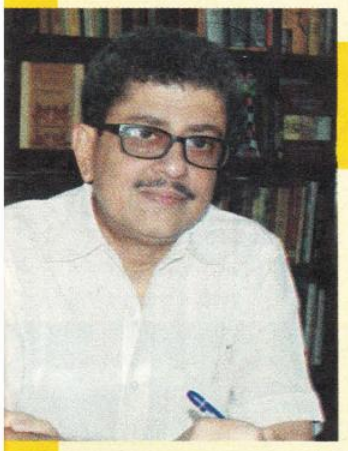

দোল-রহস্য

প্রিয় বন্ধু,

শীত শেষ। ভোরবেলায় যা একটু শিরশিরানি, বেলা বাড়তে সেটুকু উধাও। দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে। অর্থাৎ বসন্ত এসে গেছে। আর বসন্ত মানেই প্রকৃতিতে রং। শিমুল-পলাশ-কৃষ্ণচূড়া রঙে-রঙে ঝলমল করছে। রঙ লেগেছে আমাদের মনেও। বসন্ত-উৎসব মানেই যে রঙের উৎসব। দোল বা হোলি।

আমাদের ছেলেবেলায় বড় প্রিয় ছিল এই দিনটা। যৌথ পরিবারের সব ছেলেরা, সঙ্গে পিসতুতো-মাসতুতো ভাইরাও। বাড়ি একেবারে জমজম।

দাদারা নানাধরনের বাঁদুরে রঙ নিয়ে আসত। দেখতে লাল আবির, যেই না মাথায় ছড়িয়ে একমগ জল ঢেলে দেওয়া হত, অমনি ম্যাজিক! কালো কুচকুচে রঙে মুখের চেহারা এমন হত, চেনাই যেত না। বেলুনে মিশিয়েও তাক্ করে ছোঁড়া হত নিরীহ পথচারীদের দিকে। তারপর টুক করে লুকিয়ে পড়া। কেউ-কেউ মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে আদ্যশ্রাদ্ধ করতেন। কিন্তু কাউকে খুঁজে পেতেন না।

আমাদের সবার বড়দা দিলীপ ছিলেন আবার বিপরীত মেরুর। রঙ খেলা একেবারে পছন্দ করতেন না। সক্কাল-সক্কাল উঠে ব্রেকফাস্ট করে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখতেন বেলা বারোটা পর্যন্ত।

তা সেবার হয়েছে কী, আগের রাতে রঙপন্থীরা গোপনে ঠিক করেছে, এবার 'বড়দা'কে রং মাখাতেই হবে।

আমরা কুচো-কাচারা সেবার খুব সকাল-সকাল উঠে পড়েছি। বড়দা যেই না প্রাতঃকৃত্য এবং প্রাতঃরাশ সারতে খাবার ঘরে গেছেন, ওঁর খাটের তলায় ঢুকে পড়েছি। বড়দা ফিরে ঘরে ঢুকে যেই ছিটকিনি দিয়েছেন, অমনি তিন কুচো হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। প্রত্যেকের হাতে মুঠো-মুঠো রঙ। বেগুনি, লাল, সবুজ।

বড়দার চোখ বিস্ফারিত, 'অ্যাই! অ্যাই! এ কী! শিগগির বেরো! নইলে পিটিয়ে ছাতু করে দেব।'

'পারবে না, পারবে না!' মাথা দুলিয়ে তিনটে বিচ্ছু হাসছে, 'আজ দোল! বারোটা পর্যন্ত টাইম। তোমায় রঙ মাখাবই!'

বড়দা ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। কয়েকমুহূর্ত। তারপর আমরা কিছু বোঝার আগেই সাঁ করে ছুট দিলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে বড়দাকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

আমাদের উত্তর কলকাতার সাবেক বাড়ি মস্তবড়। অসংখ্য ঘর।

প্রতিটা ঘর, বাথরুম তন্নতন্ন করে খুঁজছি। ইতিমধ্যে অন্য দাদারাও সঙ্গে জুটে গেছেন। সবাই মিলে বড়দা-নিরুদ্দেশ রহস্য উন্মোচনের প্রাণপণ চেষ্টা চলছে।

নাহ্! কোথাও বড়দার চিহ্ন নেই।...ইতিমধ্যে ঘড়ির কাঁটা প্রায় ১০টা ছুঁইছুঁই। বড়দার জন্যে কি আমাদের রং খেলার বারোটা বেজে যাবে?

সুতরাং চতুর্দিকে যেমন খর দৃষ্টি থাকছে, তেমনি প্রবল উৎসাহে দোলপন্থীরা রঙ মাখামাখিও শুরু করে দিল।

এদিকে পুরোনোকালের গ্রামোফোনে আমাদের ফুলকাকা চালিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রগান। পরপর বেজে চলেছে, 'ঝর ঝর ঝর ঝর ঝরে রঙের ঝরণা....', 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে...', 'আজ সবার রঙের রঙ মিশাতে হবে...'।

সে এক অফুরন্ত আনন্দের দিন। সবাই বাঁধনছাড়া।

হঠাৎ আমার পিসতুতো ভাই ডবলু বলল, 'কী ব্যাপার বল্ তো? দিলীপদাকে কি ধরতে পারব না?'

আমরা জিজ্ঞাসুচোখে তাকালাম।

'চল্ তো, দোতলায় গিয়ে খুঁজি। লাস্ট একটা চান্স।'

'কিন্তু দোতলার সব ঘর তো তালাবন্ধ রে।'

'কেন? লাইব্রেরি হলঘর? ওটা তো বন্ধ হয় না। ভেজানো থাকে।'

তিন মূর্তি পা টিপে-টিপে দোতলায়। লাইব্রেরির বিরাট হলের দরজা খুললাম নিঃশব্দে।

সিলিং পর্যন্ত উঁচু বিশাল-বিশাল আলমারি। বেশ কিছু কাচের। স্লাইডিং। কিছু কাঠের। দু-পাল্লার। হাজার-হাজার বইয়ে ঠাসা। হলের সবক'টা জানলা বন্ধ। ভিতরে আবছা অন্ধকার।

ঘুরে-ঘুরে আলমারিগুলো দেখছি। বেড়াল-পায়ে। হঠাৎ একটা কাঠের দু-পাল্লার আলমারির সামনে এসে ডবলু দাঁড়িয়ে গেল। ঠোঁটে আঙুল চেপে ইশারায় ডাকল। ইঙ্গিতে বলল, 'কান পাত্।'

কান পাতলাম পাল্লার গায়ে। প্রশ্বাসের মৃদু শব্দ।

তিনজনের চোখ রাজভোগ। ভেতরে কে? বড়দা, না কোনও অশরীরী? কিন্তু সে হলে প্রশ্বাসের শব্দ হবে কেন?

ডবলু দেখতে ছোটখাটো, কিন্তু ডাকাবুকো। একটানে পাল্লা দুটো খুলে ফেলল।

আর অমনি ভেতর থেকে বড়দা আমাদের দেখেই ব্যাপকজোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আঁ...আঁ...আঁ...ভ্...ভূত!'

আসলে সর্বাঙ্গে রঙ মেখে মিশমিশে কালো তিনটে ছেলে সত্যি-সত্যিই তখন 'জ্যান্ত ভূতের ছানা'!

আরেকটু হলে বড়দা অজ্ঞান হয়ে পড়তেন!...

আজ এই পর্যন্ত। দোলের রঙিন শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা নিও তোমরা সবাই। ভালো থেকো।

গল্প

অনীশ দেব

আজ তোমার পরীক্ষা

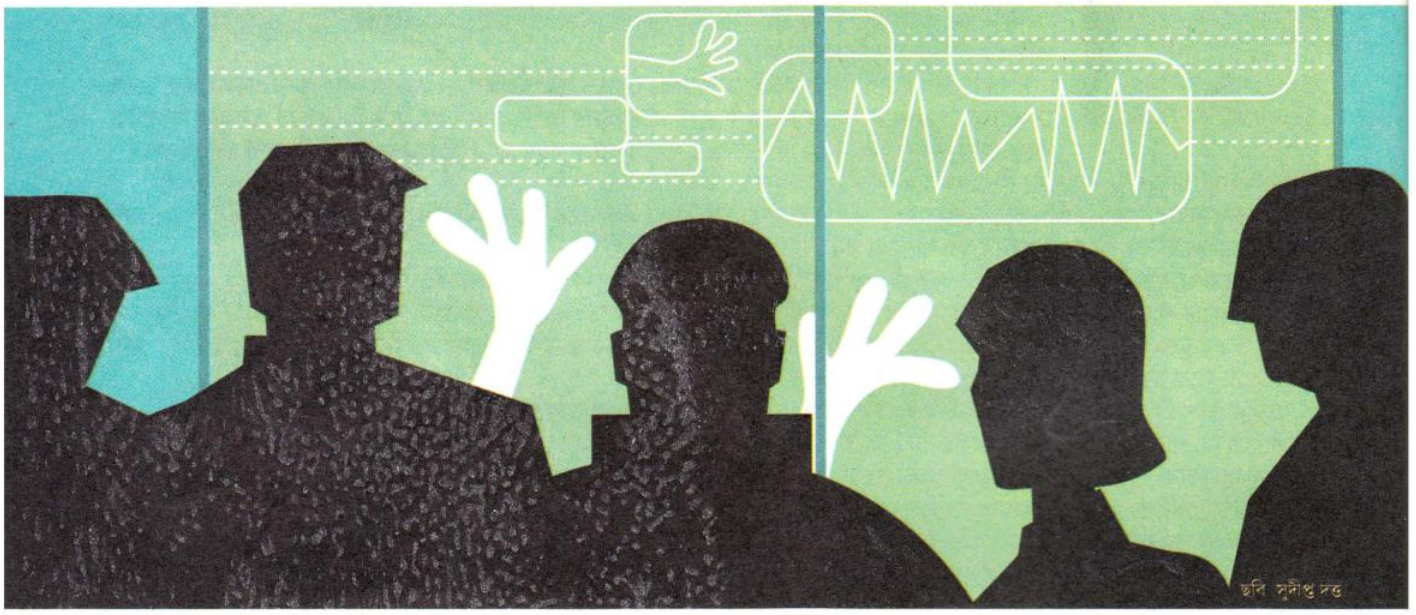

ছবি সুদীপ্ত দত্ত

তো সেই পরীক্ষাই আমরা চালাচ্ছিলাম। আমরা পাঁচজন। 'সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স রিসার্চ ইউনিট'-এর কোর গ্রুপের মেম্বার আমরা। 'সুপার ফাইভ'।

গত পনেরো বছর ধরে আমরা ভিনগ্রহীর খোঁজখবর নিয়ে চর্চা করে চলেছি। এই মহাবিশ্বের আনাচেকানাচে বুদ্ধিমান এলিয়েনের সন্ধান করাটাই আমাদের একমাত্র কাজ।

আজ আমাদের ভাগ্য খুলে গেছে। আমাদের সামনে রয়েছে জীবন্ত তরতাজা একটি ভিনগ্রহী প্রাণী। মাঝে অতি-স্বচ্ছ একটি কাচের দেওয়াল। আমরা সবাই রয়েছি ভিনগ্রহীটার মহাকাশযানের ভেতরে।

কাচের দেওয়ালের দুদিকেই অনেক যন্ত্রপাতি। আমাদের দিকের সবক'টা যন্ত্রপাতি আমাদের চেনা। তবে ভিনগ্রহীটার দিকে যেসব মেশিনপত্তর বসানো রয়েছে সেগুলো আমাদের চেনাজানার অনেক বাইরে। অথচ ও অত্যন্ত সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কখনও-কখনও সেগুলোর বোতাম টিপছে অথবা নব ঘোরাচ্ছে।

আমরা এলিয়েনটার নাম দিয়েছি এক্স। কারণ, এই অজানা-অচেনা প্রাণীটাই আমাদের দেখা প্রথম ভিনগ্রহী—মানে, আননোন ফ্যাক্টর।

এক্স-এর ব্যাপারটা মিডিয়ার কাছ থেকে বেশ কায়দা করে গোপন রাখা হয়েছে। আমরা নিশ্চিন্তে ওর মহাকাশযানের ভেতরে কাচের টেম্পোরারি পার্টিশন ওয়াল বসিয়ে ওর সঙ্গে কমিউনিকেট করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারছি।

আমরা পাঁচজনই স্টেরিলাইজ্‌ড প্রোটেক্টিভ স্যুট পরে আছি—যাতে কোনওরকম ইনফেকশনের সমস্যা না থাকে—এদিক থেকে ওদিকে, কিংবা ওদিক থেকে এদিকে।

গ্রুপ লিডার হিসেবে আমিই প্রথম সাজেস্ট করলাম, 'স্ক্র্যাচ প্যাডে সূর্যের একটা সিম্বল এঁকে ওকে দেখাও—।'

নিনা সাবরওয়াল তাই করল। ইলেকট্রনিক স্ক্র্যাচ প্যাডে সূর্যের একটা ছবি আঁকল। ছবিটা সঙ্গে-সঙ্গে মেগা স্ক্রিনে ট্রান্সফার হয়ে গেল। মেগা স্ক্রিনটা এক্সের দিকে ঘোরানো, যাতে ও সহজেই ছবিটা দেখতে পায়।

এক্স এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। কাচের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে মাঝে-মাঝে আমাদেরও খুঁটিয়ে দেখছিল। ওর বড়-বড় গোল-গোল চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছিল সারা দুনিয়ার কৌতূহল সেখানে জড়ো হয়ে আছে।

ও সূর্যের ছবিটা কয়েক সেকেন্ড দেখল। তারপর শূন্যে আঙুল ঘুরিয়ে কী যেন লিখল। তখনই খেয়াল করলাম, এক্সের লিকলিকে দুটো হাতেই চারটে করে লম্বা-লম্বা আঙুল—আমাদের আঙুলের প্রায় দেড়গুণ লম্বা।

নিনা আমার দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল, 'ব্যাপারটা কী হচ্ছে?'

আমি ঠোঁট ওলটালাম।

নিনা ফিজিক্সের লোক। কোনও ইনপুট দিলে সবসময় তার আউটপুট চায়। যেমন এখন। বেশ অহঙ্কারী মেয়ে। রোগা। বয়কাট চুল। চোখে চশমা।

হঠাৎই আউটপুট পেলাম।

এক্সের দিকে যেসব যন্ত্রপাতি রয়েছে তার মধ্যে একটা বড়সড় কম্পিউটার মনিটর ছিল। তার পরদায় হলদে রেখায় দুটো সূর্যের ছবি ফুটে উঠল।

তার মানে কি এক্স এমন এক গ্রহ থেকে এসেছে যেখানে আকাশে দুটো সূর্য দেখা যায়?

এক্স শূন্যে আঙুল নেড়ে আরও কী যেন আঁকল। একটু পরেই সেটা ওর যন্ত্রের পরদায় দেখা গেল।

দুটো সূর্যকে ঘিরে একটা উপবৃত্ত এঁকেছে এক্স। তার মানে, দুটো সূর্য একটা ডাব্‌ল স্টার বা বাইনারি স্টার সিস্টেম। আর তাদের ঘিরে আঁকা উপবৃত্তটা এক্সের গ্রহের কক্ষপথ।

শ্রেয়ান চৌধুরী আমাদের রিসার্চ গ্রুপের সবচেয়ে কমবয়েসি সদস্য। সবসময় টগবগ করে ফুটছে। বিষয় সাইকোলজি। আমাকে 'রোকান-দা' বলে ডাকে।

এক্সের প্রথম রেসপন্স নিয়ে ও আমার সঙ্গে আলোচনা জুড়ে দিল। আমি যা ভেবেছি, সেটা ওদের সাবইকে বললাম। বাইনারি স্টার। ইলিপ্‌টিক্যাল অরবিট্। সব। আরও বললাম, আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে কাছাকাছি যেসব নক্ষত্র আছে, তার অর্ধেকেরও বেশি হল বাইনারি স্টার। তাদের কোনওটার হয়তো প্ল্যানেটারি সিস্টেম আছে। কিন্তু সেটা আমাদের টেলিস্কোপের 'শ্যেনচক্ষু' এড়িয়ে গেছে।

এ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। নিনা ছাড়াও সরোজ তেওয়ারি আর হরমেশ মালহোত্রা সে-আলোচনায় ঢুকে পড়ল। সরোজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর লোক। আর হরমেশের সাবজেক্ট অ্যাস্ট্রোনমি।

শ্রেয়ান সাজেস্ট করল, এবার এক্সকে 'পিথাগোরিয়ান ট্র্যাঙ্গেল'-এর ছবি দেখানো হোক। 'পিথাগোরিয়ান ট্র্যাঙ্গেল' মানে সমকোণী ত্রিভুজ। এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইনটেলিজেন্স-এর সঙ্গে কমিউনিকেট করার ফান্ডামেন্টাল আইটেম।

সবাই সেটার ব্যাপারে একমত হল। নিনা ইলেকট্রনিক স্ক্র্যাচ প্যাডে একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকল।

এক্স সেটার দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তারপর শূন্যে আঙুল ঘুরিয়ে পালটা একটা 'পিথাগোরিয়ান ট্র্যাঙ্গেল' আঁকল। তার পাশে আঁকল একটা বর্গক্ষেত্র, এবং তার পাশে একটা অদ্ভুত চেহারার হিজিবিজি জ্যামিতিক আকার দিয়ে তৈরি ছবি।

এ কী পাগলামো! 'পিথাগোরিয়ান ট্র্যাঙ্গেল' ইনপুট দিলে তার এক্সপেক্টেড আউটপুট হল ঃ $a^2 + b^2 = c^2$। কিন্তু তার বদলে এসব কী?

এরপর আমরা পালা করে এক্সকে এক-একরকম ইনপুট দিতে লাগলাম, আর তার আউটপুট বা রেসপন্স রেকর্ড করে চললাম।

আমাদের টেস্ট প্রোগ্রামের একটানা ভিডিয়ো রেকর্ডিং চলছিল, কারণ, এক্স আমাদের কাছে খুব মূল্যবান। সারা পৃথিবীর কাছেও।

ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। পৃথিবীর নাগালে এসে যাওয়া একমাত্র এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল! ই. টি.! সেটাও আবার হাজির খোদ কলকাতায়! আমাদের হাতের নাগালে! চোখের সামনে!

শ্রেয়ান ওর কোঁকড়া চুলে হাত চালিয়ে আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'রোকন-দা, এবার ওকে একটা বাইনারি স্ট্রিং ইনপুট দিয়ে দেখি...।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'দাও।'

বাইনারি স্ট্রিং মানে, পরপর সাজানো 1 আর 0-র একটা সিকোয়েন্স। তার মাধ্যমে কিছু ইনফরমেশন জানানো হয়—আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে। যেমন, চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের ওপরে একবার পাক খায়, অভিকর্ষজ ত্বরণের মান 9.81 মিটার/সেকেন্ড^2, পৃথিবীর একটিমাত্র উপগ্রহ চাঁদ, পৃথিবীর মুক্তিবেগ 11.2 কিলোমিটার/সেকেন্ড ইত্যাদি-ইত্যাদি। কারণ, ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীরা হয়তো মহাকাশে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে এইসব তথ্য ইতিমধ্যেই জানতে পেরে গেছে।

বাইনারি স্ট্রিং ইনপুট দিয়ে এক্সের কাছ থেকে যে-আউটপুট পাওয়া গেল তার কোনওরকম মাথামুন্ডু আমরা বুঝতে পারলাম না। অসংখ্য ছোট-ছোট সরলরেখা জুড়ে তৈরি লম্বা চেহারার একটা নকশা।

নাঃ, এক্সের জ্ঞানগম্যির লেভেল নিয়ে আমার এইবার বেশ সন্দেহ হচ্ছে।

হরমেশ ঠাট্টার সুরে বলল, 'রোকান, ইতনে সালোঁ কে মেহনতকে বাদ দেখো হমে কেয়া মিলা। সুপার-ইডিয়ট ই. টি.—' বলেই ওর টিপিক্যাল অট্টহাসি। সত্যি, হরমেশটার বিহেভিয়ার এত ব্লান্ট যে, ওকে আমার সায়েন্টিস্ট বলে মানতে কষ্ট হয়। কে বলবে, ওর আই. কিউ. 142!

শুধু ও কেন, আমাদের এই কোর গ্রুপের পাঁচ জনেরই আই. কিউ. 142 থেকে 150-এর ভেতরে। এক কথায় বলতে গেলে সুপার-ইন্টেলিজেন্ট।

'স্ট্যানফোর্ড-বিনে' আই. কিউ. টেস্টের লেটেস্ট ভারসন ব্যবহার করে আমাদের আই. কিউ. মাপা হয়েছে। তার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে 'ওয়েশ্‌লার অ্যাডাপ্ট ইন্টেলিজেন্স স্কেল ফর অ্যাডাপ্‌ট্‌স'-এর কো-রিলেশন। সুতরাং নিজেদের বুদ্ধিশুদ্ধি নিয়ে একটু-আধটু অহঙ্কার তো আমাদের আছেই! তা ছাড়া, ন্যাশনাল স্পেস রিসার্চ ইন্সটিটিউটের অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে আমাদের নিকনেম হল 'সুপার ফাইভ'।

এক্সের ব্যাপারটা বেশ হইচই করে শুরু হয়েছিল। গত শুক্রবার রাতে আকাশে একটা নীল আলো দেখা গিয়েছিল। সেই উজ্জ্বল আলোটা হাই-পাওয়ার উল্কার মতো পৃথিবী লক্ষ্য করে ছুটে আসছিল। আলোটা ক্রমশ বড় হচ্ছিল, আরও উজ্জ্বল হচ্ছিল। সেদিকে যারা তাকিয়েছিল তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল রীতিমতো।

তারপর?

তারপর সবাইকে অবাক এবং হতভম্ব করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত আকাশ থেকে যে-জিনিসটা কলকাতার ময়দানে নেমে এসেছে তাকে ঠিক মহাকাশযান বলা যাবে না, আবার ফ্লাইং সসারের সঙ্গে তার চেহারাও ঠিক মেলে না।

স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে উড়ন্ত বস্তুটির যে-চেহারা দেখা গিয়েছে তাতে জিনিসটাকে দেখে রাজার মুকুট বলে ভুল হতে পারে। কারণ, অজ্ঞাতকুলশীল বিচিত্র আকারের ওই মহাকাশযানটির চেহারা একটা বড় বাটির মতো, এবং তার চারিদিকে সুন্দর করে খাঁজ কাটা। এ ছাড়া বাটির মাথায় তিনটি ডিশ অ্যান্টেনা গোছের জিনিসও দেখা গিয়েছে।

ইউ. এফ. ও. বলতে আমরা যা বুঝি সেরকম দু-চারটে ফ্লাইং অবজেক্ট এর আগে পৃথিবীতে এসে হাজির হলেও সেগুলো ছিল অ্যান-ম্যান্‌ড। মানে, সেইসব মহাকাশযানে কোনও প্রাণী ছিল না। তাই আমাদের 'সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স রিসার্চ ইউনিট'-এর সেরকম কোনও মাথাব্যথা ছিল না। কারণ, আমাদের 'ন্যাশনাল স্পেস রিসার্চ ইন্সটিটিউট'-এর স্পেশাল ডিপার্টমেন্ট 'সেটি রিসার্চ ইউনিট'-এর কারবার হল ভিনগ্রহী বা এলিয়েন নিয়ে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্ক ড্রেক-এর বিখ্যাত ড্রেক সমীকরণকে পুঁজি করে আমাদের রিসার্চ ইউনিট-এর কোর গ্রুপ গত পনেরো বছর ধরে শুধুই এলিয়েনের খোঁজ করে চলেছে—তাও আবার যে সে এলিয়েন নয়, বুদ্ধিমান এলিয়েন। ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণী।

ফ্র্যাঙ্ক ড্রেক যেমন বলেছিলেন, কাজটা অনেকটা খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতো, তো আমরা লাস্ট পনেরো বছর ধরে সেই ছুঁচই খুঁজে চলেছি।

মহাকাশযানটার আকস্মিক ল্যান্ডিং নিয়ে টিভির চ্যানেলে-চ্যানেলে উত্তেজনার খই ফুটতে শুরু করল। প্রশ্ন উঠল, শক্ত জমিতে একটা স্পেসশিপ কী করে সেফ্‌লি ল্যান্ড করতে পারল? এই টেকনোলজি তো মানুষের এখনও জানা নেই!

ওটা ময়দানে নেমে আসার সময় একটা বড় এলাকা জুড়ে গাছপালা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। আগুনের তাতে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। বেশ কিছু পাখপাখালি উড়ে পালিয়ে যাওয়ার আগেই পুড়ে মারা গেছে।

কিন্তু এর চেয়ে বড় রকমের কোনও বিপর্যয় ঘটেনি। সবচেয়ে বড় কথা, স্পেসশিপটার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি।

মহাকাশযানটি নেমে আসার খবর চাউর হতে না হতেই গোটা ময়দান এলাকাটা মিলিটারির দখলে চলে গিয়েছে। ভিনগ্রহের মহাকাশযান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়াররা কেন্দ্রীয় মহাকাশ গবেষণা মন্ত্রকের নির্দেশে কলকাতার ময়দানে টেম্পোরারি রিসার্চ ল্যাব খুলে বসেছে। তখনও জানা যায়নি, স্পেসশিপটার ভেতরে একটি ভিনগ্রহের প্রাণী রয়েছে। তাই আমাদের 'সেটি রিসার্চ ইউনিট'-কে তখনও তলব করা হয়নি।

সেটা করা হল, ভিনগ্রহীর অস্তিত্বের খবরটা জানাজানি হওয়ার পর।

তবে এই জানাজানির ব্যাপারটা জনগণ পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। সরকারি মহলের

কয়েকটি ছোট-ছোট বৃত্তের বাইরে ভিনগ্রহীর খবরটা কেউ জানতেই পারল না।

ভাগ্যিস জানতে পারেনি! কারণ, জানতে পারলে আমরা ওই এলিয়েনটাকে নিয়ে কোনওরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর চালাতে পারতাম না।

ময়দানে আমাদের অস্থায়ী রিসার্চ ক্যাম্প গজিয়ে উঠল রাতারাতি। পুরো এলাকায় রেড অ্যালার্ট। জনগণ আর মিডিয়া তো দূরস্থান, আলট্রা-হাই লেভেল ক্লিয়ারেন্স ছাড়া ওই রেড অ্যালার্ট জোনে কারও মাথা গলানোর জো নেই।

সুতরাং আমরা বেশ নিরাপদেই কাজ শুরু করতে পারলাম।

আমাদের পাঁচজনের প্রাথমিক পড়াশোনা পাঁচরকম বিষয়ে হলেও আমরা পাঁচজনই এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইনটেলিজেন্স নিয়ে ইনটেন্‌সিভ স্পেশাল ট্রেনিং নিয়েছি।

এক্সের সঙ্গে কমিউনিকেশনের চেষ্টা চলতেই লাগল। আমরা পালা করে নানান টেস্ট চালিয়ে যেতে লাগলাম। রাউন্ড দ্য ক্লক—মাঝখানে কোনও বিশ্রামের ফাঁক নেই। দরকার পড়লে পালা করে ঘুমিয়ে নিচ্ছি বটে, তবে আমাদের অন্তত দুজন সবসময় জেগে থাকছে।

এক্স কখনও-কখনও ওর দিকের আলো নিভিয়ে দিলেও আমরা ওকে দেখতে পাচ্ছিলাম। ওর গা থেকে কেমন একটা সবুজ আভা বেরোচ্ছিল। আর ওর চোখের মণি দুটোতেও সবুজ আলো জ্বলজ্বল করছিল।

লাগাতার টেস্ট চলছিল, আর টেস্টের রেজাল্ট দেখে আমরা পাঁচজন যার-যার পামটপ কম্পিউটারে নোট্‌স নিচ্ছিলাম, দরকারি মন্তব্য লিখে রাখছিলাম।

আমাদের প্রত্যেকেরই ধারণা, এক্সরা মহাকাশযান প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে থাকলেও বেসিক আই. কিউ.-র ব্যাপারটায় অনেক পিছিয়ে আছে।

তৃতীয় দিন দুপুরের পর সরোজ তেওয়ারি ওকে ইংরেজি বর্ণমালার ছাব্বিশটা বর্ণ দেখাল। প্রথমে দেখাল A থেকে Z পরপর সাজানো অবস্থায়। তার একটু পরে সেটা মুছে দিয়ে বর্ণগুলো আবার লিখল—তবে স্ক্র্যাম্বল্‌ড—মানে, এলোমেলো অবস্থায়।

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর এক্স এলোমেলো বর্ণগুলোকে ঠিকমতো পরপর সাজিয়ে ওর মনিটরে লিখে দিল।

'ব্যাটার মেমোরি তো খারাপ নয়!' তেওয়ারি হেসে বলল।

শ্রেয়ান এক্সের মনিটরের দিকে আঙুল দেখিয়ে একটু এক্সাইটেডভাবে বলল, 'রোকান-দা, দেখুন, ও অ্যালফাবেটগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে কয়েকটা পিকিউলিয়ার সিম্বল এঁকেছে!'

সত্যিই তো! আমরা সবাই কপাল কুঁচকে এক্সের মনিটরের দিকে তাকালাম।

A, B, C, D-র সিকোয়েন্সের ফাঁকে-ফাঁকে মোট চারটে ছবি এঁকেছে এক্স। চার রকমের ছবি। ছবিগুলোর ধাঁচ A, B, C, D-র মতো হলেও কম্পিউটারের আলফানিউমারিক ক্যারেক্টারের থেকে আলাদা।

কে জানে এগুলোর মানে কী!

আমরা আর কী টেস্ট দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। রীতিমতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নাঃ, শেষ পর্যন্ত এক্সের সঙ্গে আমরা সাকসেসফুলি কমিউনিকেট করতে পারলাম না।

হঠাৎ নিনা বলল, 'এভরিবডি! লুক! লুক!'

নিনা সাবরওয়াল আঙুল তুলে দেখাচ্ছিল এক্সের মনিটরের দিকে। সেখানে আরও কীসব লিখে চলেছে ভিনগ্রহের প্রাণীটা।

সেই লেখার একটি বর্ণও আমরা বুঝতে পারছিলাম না।

আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। এমনিতে আমাদের টেস্টের ইনপুট-আউটপুট রেকর্ড খতিয়ে দেখে এক্সকে মোটেই বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে না। তা হলে ওরা স্পেসশিপ টেকনোলজিতে এতটা এগোল কেমন করে?

হতে পারে এক্স শুধু এই স্পেসশিপের পাইলট—তার বেশি কিছু নয়। গাড়ির ড্রাইভার যেমন শুধু গাড়ি চালাতে পারে, গাড়ির প্রযুক্তি কিছু বোঝে না, অনেকটা সেইরকম।

হঠাৎই লক্ষ করলাম, এক্স ইংরেজি হরফে কীসব লিখছে। লেখাগুলো এত হাই স্পিডে মনিটরে স্ক্রোল করে যাচ্ছিল যে, আমরা কিছুই পড়তে পারছিলাম না।

তখনই খেয়াল করলাম, ওর নানান যন্ত্রপাতির মধ্যে একটার স্লিট দিয়ে ছাপা কাগজের পৃষ্ঠা বেরিয়ে আসছে।

আমরা উত্তেজিতভাবে আলোচনা শুরু করে দিলাম। এক্স আসলে করছেটা কী! কী ছাপছে?

ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। এক্স পরপর কয়েকটা বোতাম টিপে দিয়েছে। ওর মহাকাশযান স্টার্ট নিয়েছে। আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে।

আমরা তাড়াহুড়ো করে পাততাড়ি গোটাতে শুরু করলাম। ওর ভিনগ্রহে আমরা কেউই যেতে চাই না।

আমাদের মেশিনপত্র এপাশ-ওপাশ থেকে তুলে নিয়ে বাইরে বেরোনোর পথের দিকে সবাই ছুট লাগালাম। যেতে-যেতেই পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি এক্স হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছে।

থমকে দাঁড়ালাম। কী বলতে চায় ও?

বাকি চারজন তখন চিৎকার করে আমাকে ডাকছে। তাড়াতাড়ি চলে আসতে বলছে।

'রোকান-দা, কুইক! জলদি বেরিয়ে আসুন!'

'এক্ষুনি ওর স্পেসশিপ টেক অফ করবে।' নিনা সাবরওয়াল।

'রোকান ইয়ার, দের মত্ করো। জলদি আ যাও, বাপে!' হরমেশ মালহোত্রা।

এক্স তখন ছাপা কাগজগুলো কাচের দেওয়ালের নীচের একচিলতে ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ঝুঁকে পড়ে সেগুলো খামচে তুলে নিলাম। তারপরই ছুট—ছুট—দে ছুট।

আমরা স্পেসশিপটার বাইরে এসে দুদ্দাড় করে ছুট লাগালাম। কিছুটা ছুটে গিয়ে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। সেই চিৎপাত অবস্থাতেই দেখলাম, শব্দ আর আগুন ছড়িয়ে মহাকাশযানটা শূন্যে ভেসে উঠল। তারপর গোধূলির আকাশে আলোর মসৃণ বক্ররেখা এঁকে ক্রমশ ওপরে, আরও ওপরে, চলে যেতে লাগল।

আমি হাতে ধরা কাগজগুলোর দিকে চোখ ফেরালাম। প্রথম একজন ভিনগ্রহী পৃথিবীর অতিথি হয়ে এসে কী লিখে রেখে গেল আমাদের জন্য?

এক্সের লেখাগুলো আমি পড়েছি। তবে না পড়লেই হয়তো ভালো হত। আর কাউকে এই লেখাগুলো পড়ানোর কথা এখনও আমি ভাবতে পারছি না।

আমাদের ইংরেজি অ্যালফাবেট দেখে নেওয়ার পর এক্স কী করে যে আমাদের ভাষা রপ্ত করে ফেলেছে তা বলতে পারব না। হয়তো টেলিপ্যাথি কিংবা অন্য কোনও রহস্যময় গুণ ওকে সাহায্য করেছে।

ওর লেখার মধ্যে ব্যাকরণের প্রচুর ভুল থাকলেও লেখার অর্থ দিব্যি বোঝা যাচ্ছে।

এক্স লিখেছে ঃ

'সূর্য থেকে তিন নম্বর গ্রহটায় এসে নতুন অভিজ্ঞতা হল। এরা এদের গ্রহটার নাম রেখেছে আর্থ।

'সেই আর্থের যে-পাঁচজন স্যাম্পলকে আমি হাতের কাছে পেলাম তাদের ওপরেই নানান পরীক্ষা চালালাম। পরীক্ষার মজা হচ্ছে, মূর্খগুলো ভাবছিল ওরা আমার ওপরে পরীক্ষা চালাচ্ছে, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি স্টাডি করছে। ওদের ভুল ভাঙাইনি—বরং আমি আমার ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে গেছি। বুঝতে দিইনি যে, আসলে আমিই ওদের ওপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি।

'দেখলাম, এদের প্রযুক্তি এবং সভ্যতা আমাদের হিসেবে আদিবাসীদের লেভেলে পড়ে আছে। আর বুদ্ধি? টেলিপ্যাথিক প্রোব করে দেখলাম, এরা এখনও আদ্যিকালের ''স্ট্যানফোর্ড-বিনে'' আই. কিউ. টেস্টের চক্করে পড়ে আছে। এই পাঁচটা স্যাম্পলের আই. কিউ. 140 থেকে 150-এর মধ্যে বলে এরা নিজেদের বিরাট বুদ্ধিমান বলে ভাবছে। এরা জানে না, এদের নিয়মে আমাদের গ্রহের বাসিন্দাদের আই. কিউ. হিসেব করলে গড়পড়তা বুদ্ধিমান একজন বাসিন্দার আই. কিউ. দাঁড়াবে 315!

'আর্থের এই পাঁচ-পাঁচটা বোকা-হাঁদা আমার একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারেনি, আর আমার দেওয়া একটা উত্তরেরও মানে বুঝতে পারেনি।

'আসলে এই গণ্ডমূর্খগুলোর ডেভেলাপমেন্টের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের অহঙ্কার। বুদ্ধির হিসেবে এরা নিজেরাই নিজেদের রাজা সাজিয়ে বসে আছে। ওদের কাণ্ড দেখে আমি অনেক কষ্টে হাসি চেপে রেখেছিলাম।

'এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারছি, দম্ভের ছানি মানুষের চোখ আর মনের ওপর থেকে না সরলে মানুষ আর কখনও এগোতে পারবে না। গুড বাই।'

সৈকত মুখোপাধ্যায়

ওদের ভীষণ খিদে

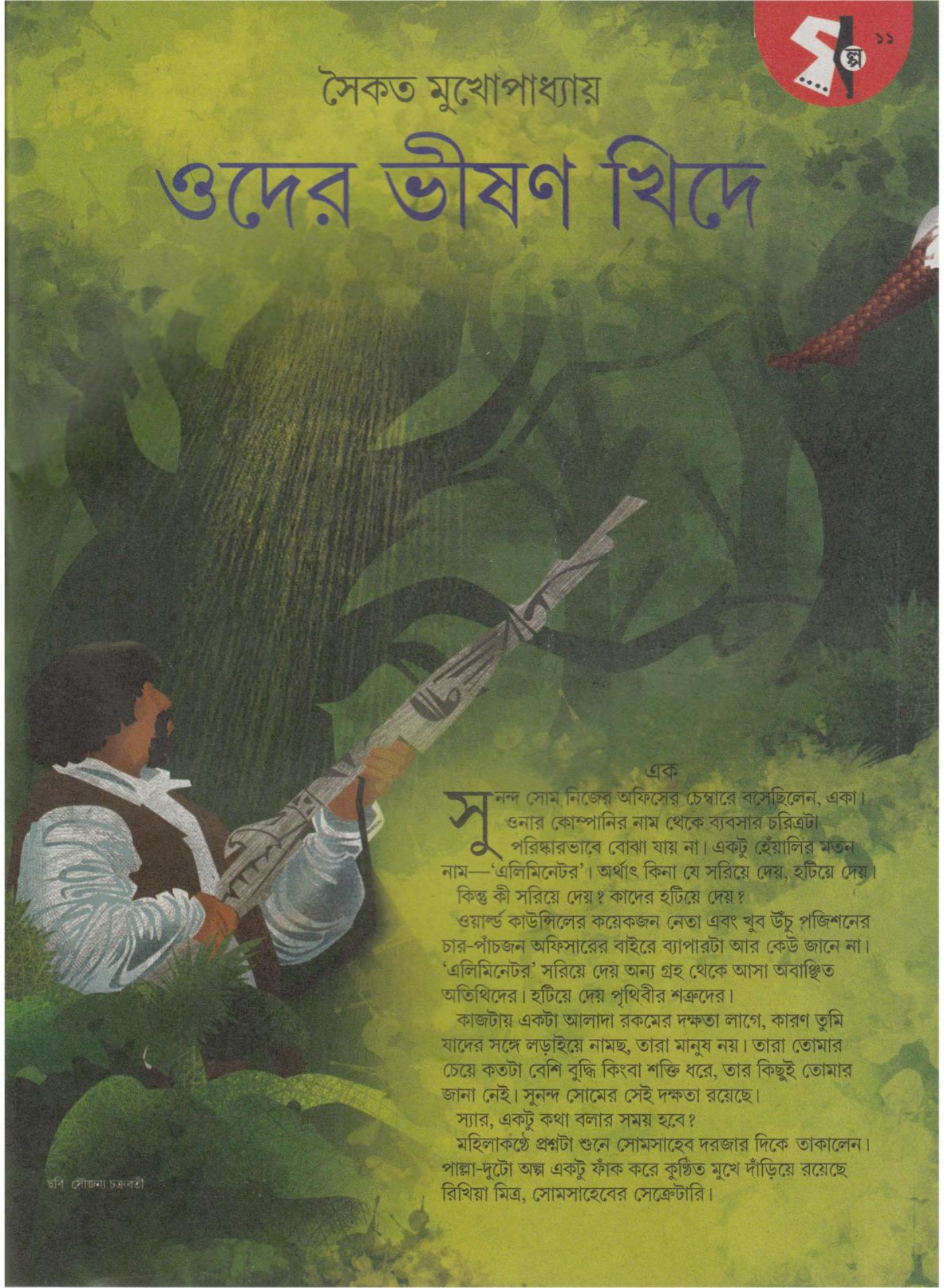

ছবি: সৌজন্য চক্রবর্তী

এক

সুনন্দ সোম নিজের অফিসের চেম্বারে বসেছিলেন, একা। ওনার কোম্পানির নাম থেকে ব্যবসার চরিত্রটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। একটু হেঁয়ালির মতন নাম—'এলিমিনেটর'। অর্থাৎ কিনা যে সরিয়ে দেয়, হটিয়ে দেয়।

কিন্তু কী সরিয়ে দেয়? কাদের হটিয়ে দেয়?

ওয়ার্ল্ড কাউন্সিলের কয়েকজন নেতা এবং খুব উঁচু পজিশনের চার-পাঁচজন অফিসারের বাইরে ব্যাপারটা আর কেউ জানে না। 'এলিমিনেটর' সরিয়ে দেয় অন্য গ্রহ থেকে আসা অবাঞ্ছিত অতিথিদের। হটিয়ে দেয় পৃথিবীর শত্রুদের।

কাজটায় একটা আলাদা রকমের দক্ষতা লাগে, কারণ তুমি যাদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামছ, তারা মানুষ নয়। তারা তোমার চেয়ে কতটা বেশি বুদ্ধি কিংবা শক্তি ধরে, তার কিছুই তোমার জানা নেই। সুনন্দ সোমের সেই দক্ষতা রয়েছে।

স্যার, একটু কথা বলার সময় হবে?

মহিলাকণ্ঠে প্রশ্নটা শুনে সোমসাহেব দরজার দিকে তাকালেন। পাল্লা-দুটো অল্প একটু ফাঁক করে কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে রিখিয়া মিত্র, সোমসাহেবের সেক্রেটারি।

কী ব্যাপার রিখিয়া? ভেতরে এসো। সোমসাহেব সামনের চেয়ারটা দেখালেন।

চেয়ারে বসে রিখিয়া ওর ছোট্ট রুমালটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। সোমসাহেব চট করে একবার এ.সি. মেশিনের ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে তাকালেন। না, রিখিয়া গরমে ঘামছে না। অন্য কোনও কারণ আছে। তিনি আবার জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার? শরীর-টরির ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ স্যার। মানে...আপনাকে ওই বাচ্চাগুলোর ব্যাপারে একটা কথা বলার ছিল।

বাচ্চা! ওহো। ওই সিঙ্গালিলা রেঞ্জ থেকে যাদের নিয়ে এসেছিলাম। হ্যাঁ, কী হয়েছে ওদের? বেঁচে আছে তো?

না স্যার। মানে হ্যাঁ স্যার। মানে অত খারাপ কিছু নয় স্যার। আসলে ওরা পাগলের মতন খেয়ে যাচ্ছে। ওদের ভীষণ খিদে। বিনতাদি বলছিলেন, ওদের খাওয়া থামাতে পারছেন না।

সোমসাহেব রিখিয়ার মুখের দিকে চুপ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। হাসি থামিয়ে চোখের কোণ থেকে জল মুছতে মুছতে বললেন, এটা কি আমাকে বলার মতন একটা সমস্যা হল রিখিয়া? বাড়ন্ত বয়সের বাচ্চারা খাবে না? এলিমিনেটরের টাকাপয়সার অবস্থা কি এতটাই খারাপ যে, দশটা বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবে না? আর কিছু বলবে?

না স্যার। অপ্রস্তুতভাবে হেসে রিখিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুই

রিখিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে সুনন্দ সোম আর কাজে মন বসাতে পারলেন না। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল পনেরোদিন আগের সিঙ্গালিলা রেঞ্জের সেই অপারেশনের ছবি। অপারেশন নীলকণ্ঠ।

একটা মাঝারিমাপের অনুপ্রবেশকারী মহাকাশযানকে ধাওয়া করে তারা ওখানে পৌঁছেছিলেন। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল স্পেসশিপটাকে। পাইনবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে বায়নাকুলার লাগিয়ে ওটার চেহারাটা ভালো করে দেখেই সোমসাহেব আর তার সঙ্গী চারজন অ্যালিয়েন-শিকারি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। সেকেন্ড জেনারেশনের একটা পুরোনো স্পেসশিপ। দেখলেই বোঝা যায় মানুষের থেকে বিজ্ঞানে প্রযুক্তিতে বেশ অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। কাজেই ওদের কব্জা করতে খুব একটা অসুবিধে হবার কথা নয়।

ভুল ভেবেছিলেন সোমসাহেবরা।

আত্মসমর্পণের ডাক দেওয়া মাত্র স্পেসশিপটার ভেতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছুটে এসেছিল। বুলেট বলেই রক্ষে। উন্নত প্রযুক্তির কোনও মারণাস্ত্র হলে ওখানেই হয়তো বডি ফেলে আসতে হত। সঙ্গে সঙ্গেই রিট্যালিয়েট করেছিলেন ওনারা। প্রায় ঘণ্টাখানেক গোলাগুলি চলার পরে সুনন্দ সোম স্ট্র্যাটেজি বদলালেন। আগেকার দিনে যেভাবে দুর্গ অবরোধ করা হত সেইভাবে স্পেসশিপটাকে অবরোধ করে বসে রইলেন।

একদিন কেটে গেল, দুদিন। তিনদিনের দিন মাঝরাতে ওরা বেরোল।

ওঃ, সে কী বীভৎস চেহারা অ্যালিয়েনগুলোর। গত কুড়ি বছরের প্রফেশনাল লাইফে কম কিসিমের গ্রহান্তরের জীব দেখেননি তিনি। কিন্তু এই সিঙ্গালিলার অ্যালিয়েন্সদের দেখে যেরকম গা শিরশির করে উঠেছিল, সেরকম আর কখনও হয়নি।

অ্যালিয়েন্সদের চেহারা যদি একেবারেই অমানুষিক হয় তাহলে সমস্যা হয় না। চৌকো প্রাণী দেখেছেন তিনি, গোল প্রাণী দেখেছেন। সবুজ জেলির মতন জীব দেখেছেন আবার কোয়ার্টজের কোষ দিয়ে তৈরি প্রাণীও দেখেছেন।

কিন্তু সেদিন মাঝরাতে যারা ওই ভিনগ্রহের মহাকাশযান থেকে নেমেছিল তাদের আকার আকৃতি সবই ছিল মানুষের মতন। শুধু ওদের সারা গা শক্ত খয়েরি রঙের আঁশে ঢাকা ছিল আর পিঠে ছিল ডানা। পাখির মতন ডানা নয়, পোকার মতন ডানা। স্বচ্ছ, শিরা-উপশিরায় ভরা একজোড়া করে ডানা।

ওরা সেই ডানায় ভর করে আকাশে উড়েছিল।

তারপর যেটা হয়েছিল সেটা মনে করতে সুনন্দ সোমের ভালো লাগছিল না। উনি পারতপক্ষে প্রাণীহত্যা করতে চান না। কিন্তু তাই বলে ভিনগ্রহীদের যথেচ্ছভাবে পৃথিবীময় ছড়িয়ে যেতেও তো দেওয়া যায় না।

জ্যোৎস্নাভরা আকাশে ওরা ছিল খুব সহজ টার্গেট। চাঁদের সামনে দিয়ে একটা একটা করে কালো সিল্যুয়েটের শরীর উড়ে যাচ্ছিল আর ওঁদের মধ্যে একজন কেউ ফায়ার করছিলেন। সকালবেলায় ওরা মোট ষোলোটা বডি খুঁজে পেয়েছিলেন। স্পেসশিপের ভেতরেও আর কোনও জনপ্রাণী ছিল না। কাজেই 'মিশন কমপ্লিট' এইরকম একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে ওনারা ফেরার পথ ধরেছিলেন।

ফেরার পথে ওরা স্রেফ কৌতূহলের বশে ঢুকেছিলেন পুরোনো এক বৌদ্ধ গুম্ফায়। আর সেই গুম্ফার উঠোনে পা দিয়েই ওই পোকা-মার্কা অ্যালিয়েন্সগুলোকে মারার জন্যে মনের মধ্যে যেটুকু খুঁতখুঁতুনি ছিল, সেটা কেটে গিয়েছিল। একা সোমসাহেবের নয়, ওনাদের পাঁচজনেরই চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। হাতের মুঠো নিশপিশ করছিল মরা পোকাগুলোকে আরেকবার মারবার জন্যে।

গুম্ফার উঠোনে অসহায়ের মতন পড়েছিল তিনজন লামার মৃতদেহ। ওদের কারা খুন করেছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি, কারণ, উঠোনে যে বুলেটের খোলগুলো ছড়িয়ে ছিল, সেগুলো সুনন্দ সোমের খুব চেনা। ওই একই খোল পাইনবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা স্পেসশিপটার চারপাশে খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে। তাছাড়া কাদার ওপর ওই লম্বা নোখওয়ালা আঙুলের ছাপ, সেও তো ভুল হবার নয়।

মৃতদেগুলোর সদ্‌গতি করে ওনারা যখন গুম্ফা থেকে বেরিয়ে আসছেন ঠিক তখনই পাঁচজনের কানে একসঙ্গে পৌঁছেছিল শিশুর কান্নার আওয়াজ। ওনারা আবার দৌড়ে গুম্ফার ভেতরে ঢুকেছিলেন। অনেক কষ্টে কান্নার আওয়াজ অনুসরণ করে যেখানে পৌঁছেছিলেন সেখানে কোনও মানুষের পক্ষে এমনিতে যাওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। গুম্ফার ঢালু চুড়োর নীচে একটা কাঠের ফলস্ সিলিং ছিল। চুড়ো আর সেই সিলিং-এর মাঝখানে একটা অন্ধকার কুঠুরির মধ্যে জড়াজড়ি করে পড়েছিল দশটা বাচ্চা। ওদের মধ্যেই কোনও একটা বাচ্চা কেঁদে উঠেছিল।

সোমসাহেবের অনেক অভিযানের সঙ্গী তারাপদ মৃধা। কঠিন মনের সেই মানুষটার মুখও দৃশ্যটা দেখে ব্যথায় কুঁকড়ে গিয়েছিল। অস্ফুট স্বরে তারাপদ বলেছিল—আহারে। রাক্ষসগুলোর হাত থেকে বাচ্চাগুলোকে বাঁচানোর জন্যে লামারা কত কষ্ট করেছিল দেখুন। কিন্তু নিজেরাই বাঁচল না। ভগবানের অনেক দয়া যে, আমরা এসে পড়েছিলাম। নাহলে বাচ্চাগুলোও বাঁচত না।

তারপর ওরা স্পেসকারে চেপে কলকাতায় ফিরেছিলেন। হ্যাঁ, অবশ্যই বাচ্চাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে।

এলিমিনেটরের একটা বিশাল প্রপার্টি রয়েছে জোকায়। সুনন্দ সোম সেখানে একটা গরিবদের স্কুল আর অনাথআশ্রম চালান। চারিদিকে সবুজ বাগান আর সবজিখেতের মধ্যে তিন-চারটে বাড়ি। তাছাড়া গোয়াল, পোলট্রি এসবও রয়েছে।

বিনতা নামে এক অবিবাহিতা দশাসই মহিলা পুরো ব্যাপারটাকে সামলান। তিনিই সোমসাহেবের কাছে খবর পেয়ে দশটা বাচ্চাকে খুশি মনে জোকার অনাথ আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তিন

দশদিন ইউরোপ সফর সেরে সোমসাহেব ফিরেছেন সবে আজ সকালেই। আর সন্ধেবেলায় রিখিয়া এসে এই অদ্ভুত কথা বলে গেল। বাচাগুলো নাকি পাগলের মতন খেয়ে যাচ্ছে। পাগলের মতন খাওয়া মানে কী?

সোমসাহেব একবার ভাবলেন, তখনই জোকা থেকে ঘুরে আসবেন। কিন্তু লম্বা টুরের পর শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল। তাই ভিডিও-ফোনটা অন করে বিনতা ম্যাডামকে ধরলেন।

হ্যাঁ, স্যার। বলুন। স্ক্রিনের ওপর বিনতা বেশ বড় একটা হাই তুলল।

খবর সব ঠিক আছে?

এতদিন অবধি কোনও কথা বলার আগে বিনতাকে দুবার ভাবতে দেখেননি সোমসাহেব। আজ দেখলেন। একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে কী যেন ভেবে নিয়ে বিনতা বললেন, হ্যাঁ, এমনিতে সব ঠিকই আছে। কিন্তু আপনি বলুন তো স্যার, বাচ্চারা কী প্রতিদিন বাড়ে?

মানে!

মানে ওই সিঙ্গালিলার দশটা বাচ্চা—গত দশদিনে একেকজনের কুড়ি কেজি করে ওয়েট বেড়েছে। ওরা ভালো করে নড়াচড়া করতে পারছে না স্যার। খাচ্ছে আর মোটা হচ্ছে।

আমাকে আগে জানাননি কেন? রাগে ফেটে পড়লেন সুনন্দ সোম। একজন ডাক্তার তো ডাকতে পারতেন। আপনি ওদের ঘরে ক্যামেরাটা ট্রান্সফার করুন তো।

ভিডিয়ো স্ক্রিনে যে ছবিটা ফুটে উঠল সেটা অনেকদিক থেকেই অস্বাভাবিক। প্রথমত, এর আগে বাচ্চাদের এমন আলসেমি করতে কখনও দ্যাখেননি সোমসাহেব। দশটা বাচ্চাই মেঝের ওপর ঢিমেতালে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। হাঁটতে পারছে না, বসতে পারছে না। বিশাল মোটা শরীর নিয়ে ওরা বুকে হেঁটে মেঝের এদিক থেকে ওদিকে যাতায়াত করছিল। ওদের চলাফেরার মধ্যে কেমন যেন একটা থলথলে কিলবিলে ভাব।

দ্বিতীয়ত, সোমসাহেব চাপাগলায় বললেন, ম্যাডাম, আমি কি ঠিক দেখছি? ওরা কি কাঁচা বাঁধাকপি খাচ্ছে?

নির্বোধ মহিলার গলায় কোনও তাপউত্তাপ দেখা গেল না। তিনি বললেন, হ্যাঁ স্যার। স্টোরে আর কিছু নেই। ক'টা বাঁধাকপি পড়েছিল, তাই এনে দিলাম। না দিলে ভয়ংকর ছটফট করছে। মেঝেতে মাথা ঠুকে ঠুকে মনে হচ্ছে মাথাগুলো ফাটিয়েই ফেলবে।

কিছুক্ষণ থম হয়ে ভিডিয়ো স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থেকে সুনন্দ সোম বললেন, আমি কাল ভোরবেলায় আপনার ওখানে পৌঁছোচ্ছি।

পরদিন ভোরে সোমসাহেবকে স্পেসকার থেকে নামতে দেখেই দৌড়ে এলেন বিনতা ম্যাডাম। ভদ্রমহিলাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বেশ উদ্বেগের মধ্যে আছেন। সুনন্দ সোম জিগ্যেস করলেন, কী হল?

স্যার, স্যার! বাচ্চাগুলো পালিয়েছে।

কী যা-তা বকছেন? ওদের বাইরে ছেড়ে রেখেছিলেন নাকি যে পালাল?

না স্যার। ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিলাম। তাও পালাল। দেখুন, দেখে যান! সোমসাহেবের হাত ধরে টানতে টানতে বিনতা ম্যাডাম তাঁকে একটা একতলা ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। এই ঘরটার ছবিই কাল রাতে ভিডিয়োতে দেখেছিলেন সোমসাহেব। মেঝের ওপর টানা বিছানা পাতা। সারা ঘর নোংরা খাবারের টুকরোয় ভর্তি। কিন্তু দুটো জানলাতেই মোটা গরাদ দেওয়া আছে।

সোমসাহেব গর্জন করে উঠলেন, গরাদ তো ভাঙেনি। বাচ্চাদের পক্ষে ভাঙা সম্ভবও না। তাহলে পালাল কেমন করে? ম্যাডাম, এবার কিন্তু আমি আপনাকে চাকরি থেকে তাড়াব।

বিনতা ম্যাডাম কান্না চেপে ফোঁসফোঁস করতে করতে ছাদের স্কাইলাইটের দিকে দেখালেন।

না, উনি মিথ্যে বলেননি। ঘরের ভেতরে ঢুকে আলো জ্বেলে সোমসাহেব দেখলেন, বারো ফুট উঁচু দেয়াল জুড়ে ছোট ছোট হাত পায়ের নোংরা ছাপ। নোংরা হাতপায়ের ছাপ ঘরের সিলিং-এও। সিঙ্গালিলার বাচ্চারা মাছির মতন দেয়াল বেয়ে, সিলিং বেয়ে হেঁটে গেছে। তারপর স্কাইলাইট গলে লাফ মেরেছে বাইরে। সুনন্দ সোম ঘর থেকে দৌড়ে বাইরে বেরোলেন।

চার

ঘরটার পেছনদিক থেকেই ঘাসজমি শুরু হয়েছে। জমির মাঝামাঝি মাথার সিঁথির মতন লম্বা লাইন ধরে জমির ঘাস দেবে গেছে। ওখান দিয়েই বুকে হেঁটে চলে গেছে ওই দশটা বাচ্চা। দশটা ভারী বাচ্চা। দশটা অলস বাচ্চা। একজনের পেছনে একজন, এইভাবে এগিয়ে গেছে ওরা।

ওই লাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন সুনন্দ সোম আর যেতে যেতে দুপাশে তাকাচ্ছিলেন। এক রাতের মধ্যেই ওরা বিনতা ম্যাডামের সাধের বাগান চৌপাট করে দিয়েছে, ওই দশটা লোভী বাচ্চা। টমেটো আর কপির খেতে একটা গাছেও পাতা নেই। সারারাত পেট ভরে খেয়েছে ওরা। কিন্তু তারপর? ওরা কোথায় লুকিয়ে পড়ল?

সুনন্দ সোমের মতন অভিজ্ঞ শিকারিও ওদের ট্রেল হারিয়ে ফেললেন। একটা বিরাট পুকুর আর তাকে ঘিরে দু-বিঘের আমবাগান। ওইখানে পৌঁছিয়েই ভারী শরীরের ছাপ হারিয়ে গেল। ওইখান থেকেই বাচ্চাগুলো যেন স্রেফ হাওয়া হয়ে গেল, আর কোথাও ওদের খুঁজে পাওয়া গেল না। মাটিতে না, গাছে না, এমনকী সবথেকে খারাপ সম্ভাবনার কথাটা ভেবে সোমসাহেব পুকুরেও জাল ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই জালেও মাছ ছাড়া আর কিছু উঠল না।

সুনন্দ সোম কলকাতায় ফিরে এলেন। কেটে গেল আরও পনেরোটা দিন। এই পনেরোদিনে সুনন্দ সোম তার প্রতিদিনের রুটিন মেনে স্পেসশিপের ওপর নজরদারি চালিয়েছেন। ফাইলে সই করেছেন। লেজার গানের লেন্স পরিষ্কার করেছেন। ওয়ার্ল্ড কাউন্সিলে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। কিন্তু সব কাজের মধ্যে তার মন পড়ে থেকেছে জোকার সেই খামারবাড়িটার দিকে। বাচ্চাগুলো গেল কোথায়?

পনেরোদিনের মাথায় তিনি অফিসে ঢুকতেই রিখিয়া ডেস্কের ওপর খুলে রাখা একটা বই চটপট ড্রয়ারে লুকোতে গিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল। সুনন্দ সোম মুচকি হেসে বইটা মেঝে থেকে তুলে রিখিয়াকে ফেরত দিতে গিয়েও থেমে গেলেন। রিখিয়ার একটা বারো বছরের মেয়ে আছে তিনি জানেন। এটা তারই স্কুলের জীবনবিজ্ঞানের বই। রিখিয়া সকালের এই ফাঁকা সময়টায় মেয়ের পড়ার বই পড়ছিল, অনেক মা-ই যেমন পড়ে। বাড়ি ফিরে নিশ্চয় হোম-টাস্ক করতে মেয়েকে হেল্প করবে। কিন্তু বইটার মলাটে এটা কীসের ছবি?

সোমসাহেবের মাথার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। এত বোকা তিনি! এত সময় লাগল তার ব্যাপারটা বুঝতে! পকেট থেকে সেল-ফোন বার করে তারাপদ মৃধাকে ডাকলেন—তারাপদ, পাঁচমিনিটের মধ্যে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াও। জোকা যাব। সঙ্গে বন্দুকটা নিও।

পনেরো মিনিট বাদে আবার সেই আমবাগান। বাচ্চাগুলোকে খুঁজে পেতে আর কোনও অসুবিধে হল না। কারণ সোমসাহেব এবারে জানতেন তিনি কোথায় খুঁজবেন, কী খুঁজবেন।

তিনি আর তারাপদ বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গুনতে শুরু করলেন—এক, দুই, তিন, চার। পাঁচ, ছয়, সাত, আট। নয়, দশ। হ্যাঁ, দশটাই আছে। না দশটা বাচ্চা নয়। দশটা গুঁটি। পাশবালিশের মতন বড় আর ঘন সুবজ রঙের দশটা গুঁটি আমগাছের সবুজ পাতার সঙ্গে রং মিলিয়ে ঝুলছে।

ওরা চুপ করে একটা গাছের নীচে বসে রইলেন।

একটু বাদেই ওদের সামনের গাছ থেকে ঝুলতে থাকা গুটিটা নড়তে শুরু করল। ওটা নড়ছে, মোচড় খাচ্ছে। নড়ছে, মোচড় খাচ্ছে। তারপর হঠাৎ গুঁটির খোলশটা ফেটে গেল আর সেই ফাটা খোলশের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটা পা। ঘন খয়েরি রঙের আঁশে ঢাকা মানুষের পায়ের মতন একটা পা। তারপর আরেকটা পা। তারপর আঁশে ঢাকা পিঠ। স্বচ্ছ শিরা-উপশিরায় ভরা ডানা।

সোমসাহেবের শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা কাঁপুনি ছড়িয়ে গেল। তাঁর মনে পড়ে গেল গুম্ফার ছাদের কাছে সেই অন্ধকার কুঠুরিতে অনেক ডিমের খোলা পড়ে ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন সুনন্দ সোম। ডাকলেন, চলো তারাপদ। সময় হয়ে গেছে।

ওরা একটার পর একটা গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালেন। সব গাছের নীচে নয়, শুধু সেই গাছগুলোর নীচে যেগুলোর ডাল থেকে সবুজ পাশবালিশের মতন গুটি ঝুলছিল। প্রত্যেকটা গুঁটির মধ্যে তখন সেই খোলশ ফাটিয়ে বাইরে বেরোনোর অস্থিরতা। প্রতিটা গুঁটিই নড়ছে, মোচড়াচ্ছে। দশটা গুঁটির প্রত্যেকটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে শক্ত আঁশে ঢাকা পা। পিঠ। ডানা।

দুজনে মিলে ঠিক দশবারই ওনারা ফায়ার করলেন।

ফেরবার পথে তারাপদ মৃধা আর সুনন্দ সোমের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় হলই না। একবার শুধু তারাপদ জিগ্যেস করেছিলেন—তাহলে ওই বাচ্চাগুলো অ্যালিয়েন্‌সদের লার্ভা?

সুনন্দ সোম বললেন, হুঁ।

অ্যাডাল্টগুলোর থেকে এত আলাদা দেখতে!

অবাক হোচ্ছো কেন? শুঁয়োপোকা আর প্রজাপতির মধ্যে কোনও মিল আছে? যদি ভুলে গিয়ে থাকো, রিখিয়ার কাছ থেকে ওর মেয়ের জীবনবিজ্ঞানের বইটা একটু চেয়ে নিও। ওটার মলাটে প্রজাপতির জীবনচক্রের ছবি আছে।

গল্প

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

অদ্ভুত যাত্রী

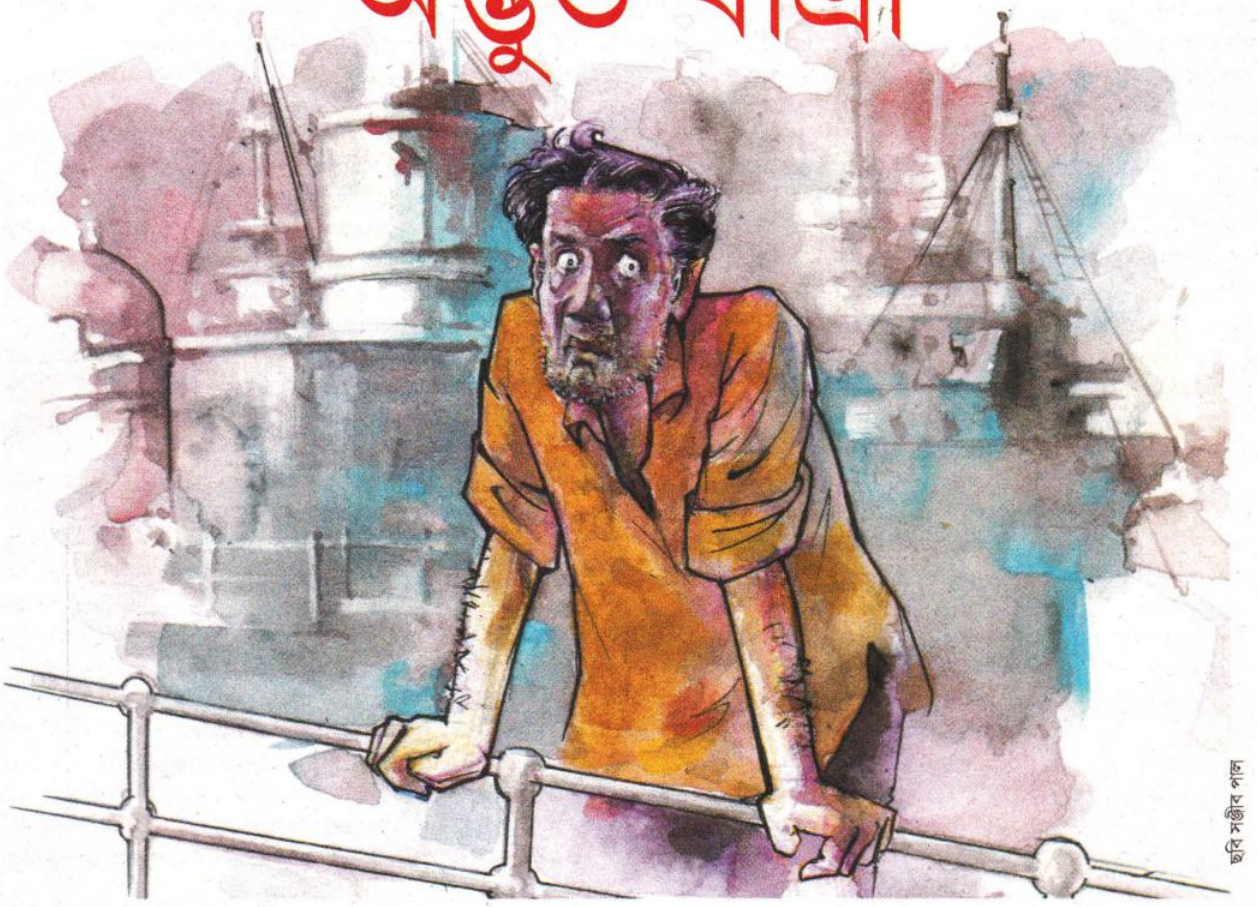

ছবি সঞ্জীব পাল

সৃঞ্জয় সাত সকালেই টেলিফোনটা পেল। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে মুম্বাই পোর্ট অথরিটির পাবলিক রিলেশন অফিসার প্রভাকর রেড্ডি বললেন, 'মিস্টার রক্ষিত, আপনি কি বেলা দশটা নাগাদ একবার অনুগ্রহ করে পোর্টে আসতে পারবেন?'

ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার মুম্বাই পোর্টে যাবার সূত্রে মিস্টার রেড্ডি সৃঞ্জয়ের পূর্ব পরিচিত। পেশাগতভাবে সৃঞ্জয় একটা কলেজে নৃতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকতা করলেও তার বিশেষ পরিচিতি মানবাধিকার আন্দোলনের একজন কর্মী হিসাবে। আন্তর্জাতিক মানবধিকার সংস্থার অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশানাল সৃঞ্জয়কে এদেশে তাঁদের সম্মানীয় আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসাবেও কিছুদিন হল নির্বাচিত করেছে। এদেশেও মানবাধীকার সংক্রান্ত বেশ কয়েকটা সরকারি কমিটিতে সে আছে। একাজের জন্যই মাঝে মাঝে এখান-ওখান থেকে ডাক আসে তার। এই যেমন তাকে অনেক সময় ডকেও যেতে হয়। এর কারণ হল, অনেক সময় ভিনদেশি জাহাজের কুলি-খালাসি অর্থাৎ পদমর্যাদায় নিম্নশ্রেণির কর্মীরা অনেক সময় বন্দরে নেমে জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ জানায়। বিশেষত যেসব মালবাহী জাহাজের ক্যাপ্টেন ও উচ্চপদমর্যাদার অফিসাররা সাদা চামড়ার ও কুলিশ্রেণির লোকরা কালো চামড়ার, সেখান থেকে এখনও এ ধরনের কিছু অভিযোগ এই সভ্য পৃথিবীতেও পাওয়া যায়। সৃঞ্জয় যেহেতু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, তাই ওইসব ক্ষেত্রে অনেক সময় সৃঞ্জয়কে বন্দর কর্তৃপক্ষ ডেকে পাঠায়। সৃঞ্জয় অনেক সময় অভিযুক্ত আর অভিযোগকারীর সঙ্গে কথা বলে বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটায়। আর যেসব ক্ষেত্রে মানবাধিকার স্পষ্টতই লঙ্ঘিত হয়েছে বা হচ্ছে বলে তার মনে হয়, সেসব ক্ষেত্রে সে বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেয়। বন্দর কর্তৃপক্ষ হয়তো তখন অভিযুক্ত ব্যক্তি বা জাহাজ কোম্পানিকে জরিমানা করে, প্রয়োজনবোধে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে অন্য কোনও ভাবে তার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করে।

সৃঞ্জয় মিস্টার রেড্ডির কথা শুনে জানতে চাইল, 'কোথাকার জাহাজ? সাদা চামড়া-কালো চামড়ার ব্যাপার নাকি?'

মিস্টার রেড্ডি বললেন, 'আফ্রিকান জাহাজ। তবে এটা ওই ধরনের কোনও ঘটনা নয়। একটা অদ্ভুত ব্যাপার! আপনি এলেই বুঝতে পারবেন। আমি হারবার মাস্টারের ঘরে আপনার জন্য অপেক্ষা করব।'

তাঁর কথা শুনে সৃঞ্জয় 'আচ্ছা' বলাতে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিলেন রেড্ডি। সৃঞ্জয়কে বেশ আকর্ষণ করল রেড্ডির বলা 'অদ্ভুত ব্যাপার' কথাটা।

ঠিক সময়তেই সৃঞ্জয় পৌঁছে গেল পোর্টে হারবার মাস্টারের ঘরে। রেড্ডি তাঁর কথা মতোই হারবার মাস্টার আর জনাকয়েক কর্মচারীকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর ঘরে। আনুষ্ঠানিক সৌজন্যতা বিনিময় করার পর চেয়ারে বসে সৃঞ্জয় প্রশ্ন করল, 'আপনাদের অদ্ভুত ব্যাপারটা কী এবার বলুন?'

মিস্টার রেড্ডি বললেন, 'হ্যাঁ, অদ্ভুত ব্যাপারই বটে। শুনলেই বুঝতে পারবেন। একটা ছোট্ট আফ্রিকান জাহাজ গতকাল সকালে খাড়িতে এসে দাঁড়ায়। জাহাজটার নাম 'তারকানা।' কাগজপত্র দেখে যা বোঝা গেছে তাতে মাস ছয়

আগে তারকানা মোম্বাসা থেকে রওনা হয়ে প্রথমে গেছিল সোমালিয়ার মোগদিসু বন্দরে। সেখান থেকে কিছুদিন পর কলম্ব গিয়ে সেখানে বেশ কয়েকমাস থাকে। অবশেষে সে মোম্বাসা ফেরার পথ ধরেছিল। কিন্তু কয়েকদিন আগে ভারত মহাসাগরে একটানা বেশ কয়েকদিন প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা হয়। তা জাহাজটাকে উত্তর দিকে বেশ কিছুটা ঠেলে আনে। ছোট জাহাজ। ক্রু-এর সংখ্যা মাত্র বারোজন। বড় স্টিমারই বলা ভালো। যাই হোক, ঝড়ের দাপটে খোলের একটা অংশ সামান্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর সেটা দেখে জাহাজটাকে নিয়ে আসা হয় মুম্বাই বন্দরের ডক ইয়ার্ডে মেরামতির জন্য। এ পর্যন্ত সবকিছু স্বাভাবিকই ছিল। এর পরের অংশটা হারবার মাস্টার বলবেন—'এই বলে তিনি তাকালেন হারবার মাস্টারের দিকে।

হারবার মাস্টার বলতে শুরু করলেন। জাহাজটা থেকে আমার কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। আমি ইঞ্জিনিয়ার পাঠালাম। জাহাজ পরিদর্শন করে তিনি জাহাজ থেকে আমাকে জানালেন যে ক্ষয়ক্ষতি তেমন কিছু নয়। ড্রাই ডকে জাহাজটাকে টেনে আনার দরকার নেই। জনা দশেক কর্মী ঘণ্টা চারেক সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা মেরামত করে ফেলতে পারবে। মিস্ত্রি আর লেবার পাঠানো হোক। সেই মতো আমি লোক পাঠাই। সন্ধ্যা নাগাদ কাজ শেষ হয়ে যায় সব ঠিকঠাক মতো। আর এর পরই ঘটে ঘটনাটা। কাজ শেষ করে যখন সবাই জাহাজ থেকে স্পিড বোটে নামতে যাচ্ছে, তখন ডেকে একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শিবরাজন নামের এক তামিল মিস্ত্রি 'মুরুগান' মুরুগান' বলে চিৎকার করতে করতে লোকটাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে। শিবরাজনের বক্তব্য ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা তার দাদা। আফ্রিকায় কাজ করতে গিয়ে সে আর ফেরেনি। শেষ দশবছর তার কোনও খবরও পায়নি মুরুগান বা শিবরাজনের পরিবার। মজার ব্যাপার হল, ডেকে দাঁড়ানো ওই লোকটা কিন্তু নির্বাক ছিল। সে যেন চিনতেই পারছে না মুরুগানকে। শিবরাজনের চিৎকার-চেঁচামেচিতে সেখানে হাজির হয় জাহাজের অন্যরা। তার মধ্যে ছিল জাহাজটা যিনি ভাড়া নিয়েছেন, সেই ভদ্রলোক। তিনি জাতিতে আফ্রিকান। নাম উবাঙ্গি। তিনি ব্যবসায়ী। উবাঙ্গির বক্তব্য, যাকে মুরুগান বলে ডাকা হচ্ছে সে জন্মসূত্রে ভারতীয় হলেও তার নাম বেকন। কেনিয়াতে তার তিন পুরুষের বাস। বেকন উবাঙ্গির খাস ভৃত্য। সে মুরুগান নয়। একথা বলার পর সেই মুরুগান বা বেকনকে তিনি নির্দেশ দেন নিজের কেবিনে ফিরে যাবার জন্য। আর এর পরই সেই লোকটা তাঁর নির্দেশ মতো শিবরাজনকে এক ধাক্কায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজের কেবিনে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। শিবরাজনের হাজার ডাকাডাকি সত্ত্বেও সে আর দরজা খোলেনি। এখন মুশকিল হল, শিবরাজন পোর্টে ফিরে এসে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে উবাঙ্গির নামে। তার ধারণা, উবাঙ্গি আসলে ভয় দেখিয়ে মুরুগানকে আটকে রেখেছে নিজের কাছে। যে কারণে মুরুগান তার নিজের ভাইকে না চেনার ভান করছে। তাকে মুক্ত করতে হবে। সে নিশ্চিত যে লোকটা তার দাদাই। লিখিত অভিযোগ যখন, তখন আমাদের কিছু একটা করতেই হবে। তা ছাড়া লোকটা যদি সত্যিই মুরুগান হয়ে থাকে এবং তার মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়ে থাকে, তবে আমাদের নৈতিক একটা দায়িত্ব কিন্তু থেকেই যায়। বিশেষত শিবরাজন যখন খুব জোর দিয়ে বলছে যে ওই লোকটা তার দাদা। তাই তদন্ত করার কারণে জাহাজটাকে আমরা বন্দর ছাড়ার অনুমতি দিইনি।

সৃঞ্জয় বলল, 'এমনও তো হতে পারে লোকটা ওর দাদা নয়? অনেক সময় দুটো লোকের চেহারার অদ্ভুত মিল থাকে।' তার কথা শুনে হারবার মাস্টার বলল, 'বন্দরে দীর্ঘ দিন কাজ করার সুবাদে আমরা শিবরাজনকে চিনি। লোকটা বেশ বিচক্ষণ, শান্ত প্রকৃতির লোক। ও নিশ্চিতভাবেই কথাটা বলছে। আপনি আসবেন বলে ওকেও আমরা ডেকে পাঠিয়েছি। পাশের ঘরেই আছে। ওর মুখ থেকেই ওর কথা শুনুন।'

এ কথা বলা পর পোর্টের একজন কর্মী ঘর থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন লোককে নিয়ে হাজির হল সেই ঘরে। মাঝবয়সি একজন লোক। বছর চল্লিশ বয়স হবে। গোড়ালির ওপর নীল প্যান্ট, হাফ হাতা নীল শার্ট, আর শিরা ওঠা সুগঠিত হাত তাকে ডকের মিস্ত্রি বলে চিনিয়ে দেয়। তার বুকে হারবার অথরিটির এমবস আঁকা আইডেনটিটি কার্ডও আছে। শিবরাজন। তার উদ্দেশ্যে হারবার মাস্টার সৃঞ্জয়কে দেখিয়ে বললেন, তোমার ঘটনাটা নিয়ে এই সাহেব যা যা জানতে চাইছেন তা বলো। উনি যদি কোনও সমাধান করতে পারেন ঘটনাটার।

শিবরাজন বলে লোকটা সেলাম ঠুকল সৃঞ্জয়ের উদ্দেশ্যে।

সৃঞ্জয় তাকে জিগ্যেস করল, 'ওই লোকটা যে তোমার দাদা তা তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, হুজুর।' বেশ দৃঢ় ভাবেই জবাব দিল লোকটা।

'কী করে নিশ্চিত হলে? এমনও তো হতে পারে সে অন্য লোক। একই রকম লোক তো দেখতে হতেই পারে?'

শিবরাজন বলল 'তা হয়। কিন্তু আমি নিশ্চিত হলাম ওর বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটা দেখে। ছেলেবেলায় একবার ডাব কাটতে গিয়ে ওর বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটা অর্ধেক উড়ে যায়। দেখুন গিয়ে ওরও ওই আঙুলটা অর্ধেক নেই। এটা দেখেই তো নিশ্চিত হলাম যে আমার দাদা।'

সৃঞ্জয় বলল, 'আচ্ছা তোমার কথা নয় মানলাম। এমনও তো হতে পারে লোকটা তোমার দাদা, কিন্তু সে আর তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইছে না। তাই না চেনার ভান করছে। সেক্ষেত্রে তো আমাদের কিছু করার নেই।'

শিবরাজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'না, হুজুর না। তা হতেই পারে না। নির্ঘাত ওই দেঁতো কাফ্রিটা কোনও ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছে। যে দাদা আমাদের মানুষ করার জন্য দেশ ছেড়ে অতদূরে চাকরি করতে গেছিল, যার দয়ায় আমরা সাত জনের পরিবার এক সময় খেয়ে-পরে বেঁচে থেকেছি, আর যাই হোক সে আমাদের অচেনার ভান করতেই পারে না। এর মধ্যে ওই কাফ্রি শয়তানটার নিশ্চয়ই কোনও কারসাজি আছে। এই দেখুন দশ বছর আগে আমাদের পাঠানো তার শেষ চিঠি। দশ বছর আগে এসেছিল। সে বলেছিল আর ক'দিনের মধ্যেই সে মোম্বাসা থেকে দেশে ফেরার জাহাজ ধরবে। দোহাই হুজুর, দাদাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন...।' এই বলে সে পকেট থেকে বিবর্ণ একটা চিঠি বার করে এগিয়ে দিল সৃঞ্জয়ের দিকে। তারপর ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

সৃঞ্জয় চিঠিটা হাতে নিয়ে দেখল। শিবরাজনের বক্তব্য সমর্থন করছে সেই বিবর্ণ কাগজটা। তার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছে জনৈক মুরুগান। তারিখটা বছর দশেক আগের। ঠিকানা লেখা আছে—'কিকুউ ভিলেজ, মালিন্দি, কিনিয়া।'

'মালিন্দি' শব্দটা শুনে ঘটনাচক্রে একজনের কথা মনে পড়ে গেল সৃঞ্জয়ের। তার নাম 'লুও তানা'। আরব বংশদ্ভুত একজন মানবাধিকার কর্মী। নাইরোবিতে মানবাধিকার সম্মেলনে একবার অ্যামানেস্টির প্রতিনিধি হিসাবে গেছিল সৃঞ্জয়। তখনই লুও তানার সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব। মাঝে মাঝে ই-মেলে সৃঞ্জয়ের সঙ্গে তার কথা হয়। 'মালিন্দি' নামটা লুও তানার কাছে থেকেই শোনা। তিনি সে শহরেই থাকেন। যা হোক, সেটা অন্য প্রসঙ্গ। সৃঞ্জয় শিবরাজনকে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও। দেখা যাক কী করা যায়?'

শিবরাজন ঘর থেকে বেরোবার পর সেই চিঠিটা হাতে নিয়ে সৃঞ্জয় বলল, 'শিবরাজনের তথাকথিত দাদা, তার মালিক আর জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কী ভাবে দেখা করা যায়? শিবরাজনকেও সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে।'

হারবার মাস্টার বললেন, 'চলুন তবে সেই জাহাজেই যাই। স্পিড বোট তৈরি আছে, কোনও অসুবিধে হবে না।

হারবার মাস্টারের অফিস থেকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে তারকানার ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দেওয়া হল যে তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই সে জাহাজে যাচ্ছে।

২

হারবার মাস্টারের অফিস থেকে প্রথমে জেটি; তারপর স্পিড বোট। সৃঞ্জয়, মিস্টার রেড্ডি, হারবার মাস্টার আর শিবরাজনকে নিয়ে রওনা হল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কিছু জাহাজ, জলযানের বেড়াজাল টপকে মিনিট দশেকের মধ্যেই 'তারকানা।' বয়সেও বেশ প্রাচীন বলেই মনে হয় জাহাজটা। সৃঞ্জয় জানতে চাইল, 'এর খোলে কী আছে জানেন?'

হারবার মাস্টার জবাব দিলেন, 'মশলা আর নারকেল। শ্রীলঙ্কা থেকে তোলা হয়েছে।'

আগাম খবর পেয়ে সৃঞ্জয়দের জন্য জাহাজের ডেকেই দাঁড়িয়েছিলেন ক্যাপ্টেন। তিনি সাদা চামড়ার লোক। হারবার মাস্টার জানালেন ক্যাপ্টেনের নাম থমসন। সে একজন আফ্রিকান্ডার। অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গবংশদ্ভুত আফ্রিকান। বোট থেকে জাহাজে উঠে আনুষ্ঠানিক পরিচয়পর্ব মেটার পর সৃঞ্জয় ক্যাপ্টেনকে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, মিস্টার উবাঙ্গির সঙ্গে তার ভৃত্য বেকনের সম্পর্ক কেমন বলে মনে হয়? বেকন তার মালিক সম্পর্কে কোনও সময় আপনার কাছে কোনও অভিযোগ করেছে? আপনার কী মনে হয়েছে বেকনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সফরসঙ্গী করেছেন উবাঙ্গি?'

তার প্রশ্নর উত্তরে মুহূর্ত খানেক চুপ করে থেকে ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমার তেমন কিছু মনে হয়নি। বেকন বলে লোকটা সাধারণত সূর্য ডোবার আগে কেবিন থেকে বেরোয় না। ইঙ্গিত বা 'হ্যাঁ' বা 'না' ছাড়া কারো সঙ্গে কোনও কথাবার্তা না বললেও তেমন কিছু ঘটনা ঘটলে সে নিশ্চয়ই আমাদের জানাত। আমার বরং ওদের দুজনের সম্পর্ক বেশ দৃঢ় বলেই মনে হয়েছে। সোমালিয়াতে পাইরেটসরা একবার আমাদের জাহাজে গুলি চালিয়েছিল। তখন ডেকে ছিলেন উবাঙ্গি। গুলির আঘাত যাতে না লাগে উবাঙ্গির দেহে, সেজন্য নিজের দেহ দিয়ে আমি বেকনকে আড়াল করতে দেখেছি উবাঙ্গিকে। আর ওরা দুজনেই কালো চামড়ার লোক। কাজেই বর্ণবৈষম্যের ব্যাপার নিশ্চয়ই এখানে নেই। আপনাদের কোনও সন্দেহ থাকলে তা নিরসনের জন্য চলুন আপনারা ওদের সঙ্গে কথা বলতে। আমি মিস্টার উবাঙ্গিকে জানিয়েছি যে আপনারা আসছেন।'—এই বলে ক্যাপ্টেন তাদের সবাইকে নিয়ে এগোলেন দুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানোর জন্য।

নির্দিষ্ট কেবিনে ক্যাপ্টেন টোকা দিতেই দরজা খুললেন এক দীর্ঘদেহী আফ্রিকান ভদ্রলোক। তাঁর পরনে জোব্বা, কপালে কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। গলা থেকে বুক পর্যন্ত নানা রঙের পাথরের মালা। একটা দাঁতও ঝুলছে লকেট হিসাবে। সম্ভবত সেটা সিংহের দাঁত। সৃঞ্জয়দের দেখে উবাঙ্গি নামের সেই ভদ্রলোক বেশ অসন্তোষের সুরে বললেন, 'একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে এত জলঘোলা হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না। এমনিতেই আমাদের দেরি হয়ে গেছে, তারপর আজকের দিনটাও আমাদের আটকে রাখা হল। আমার অনেক ক্ষতি হচ্ছে। আপনাদের যা জানার আছে জেনে, কাগজপত্র দেখে আমাদের যাবার অনুমতি দিন।

সৃঞ্জয় বলল,'আপনার অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত। আমরা আপনার সঙ্গীর সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিক আছে বলুন। ও আমার ঘরেই আছে।'

সৃঞ্জয় বলল, 'ওকে বাইরে আসতে বলুন। বোঝার কোনও ভুল থাকলে দিনের আলোতে দেখে সেটা কেটে যেতে পারে।' উবাঙ্গি প্রথমে জানালেন, 'ওর একটা সমস্যা আছে চোখে। সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না।' এরপর যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললেন, 'ঠিক আছে। আলোতেই দেখুন।' উবাঙ্গি হাঁক দিলেন, 'বেকন বাইরে এসো।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে-ঘর থেকে ডেকের সূর্যালোকে বেরিয়ে এল একজন লোক। তার গায়ে হাফশার্ট। দেহের চামড়া কেমন যেন খসখসে, ফাটাফাটা। কিন্তু তার আগেই সৃঞ্জয় মুহূর্তখানেকের জন্য তার চোখ দুটো দেখতে পেল। চোখের কালো মনির অংশ যেন দেখাই যায় না। চোখের সাদা অংশটাই শুধু প্রকট হয়ে আছে। বাঁ-হাতে বুড়ো আঙুল কাটা। তাকে দেখেই শিবরাজন বিহ্বল ভাবে বলে উঠল, 'মুরুগান, দাদা দাদা!'

কিন্তু সে লোকটার কোনও ভাবান্তর হল না শিবরাজনের কথায়।

হারবার মাস্টার তাকে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার নাম কী? তুমি শিবরাজন নামের এই লোকটাকে চেনো? সে অস্পষ্ট ভাবে জবাব দিল, 'বেকন।' তারপর মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল যে সে তাকে চেনে না।'

শিবরাজন এবার আর্তনাদ করে উঠল, 'দাদা, তুই আমাকে চিনতে পারছিস না?'

এবারও নির্বিকার লোকটা।

সৃঞ্জয় খেয়াল করল, শিবরাজন তাকে দাদা বললেও লোকটাকে কিন্তু বয়সে তার থেকে ছোট বলেই মনে হচ্ছে। সৃঞ্জয় এবার তাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি এ জাহাজে স্ব-ইচ্ছায় আছ তো? কেউ তোমাকে আটকে রাখেনি তো? নির্ভয়ে বলো। তেমন হলে আমরা তোমাকে উদ্ধার করব।

মুহূর্ত খানেক চুপ করে থেকে সে-লোক জবাব দিল, 'না,নিজের ইচ্ছাতেই আছি। আমি আমার মালিকের সঙ্গেই থাকব। তিনি যেখানে নিয়ে যাবেন, সেখানেই যাব।' লোকটা এরপর যেন মৃদু টলতে শুরু করল।

উবাঙ্গির ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'আশাকরি আপনারা এবার ওর সব প্রশ্নর উত্তর পেলেন। এবার ওকে ঘরে ঢুকতে দিন। ও আর রোদ সহ্য করতে পারছে না।

সৃঞ্জয়দের এরপর আইনত আর কিছু করার নেই। সে বলল, 'ঠিক আছে, ও ঘরে যাক।'

লোকটা টলতে টলতে ঘরে ঢুকে গেল। উবাঙ্গি এরপর সে-ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার আগে হারবার মাস্টারের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আশাকরি সন্ধ্যায় জোয়ারের জল খাঁড়িতে ঢুকলে আমরা যাত্রা শুরু করতে পারব। নইলে ক্ষতিপূরণের মামলা করব।' দরজা বন্ধ হয়ে গেল উবাঙ্গির ঘরের।

সৃঞ্জয়রা জাহাজ থেকে নামার পথ ধরল। তাদের সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে ক্যাপ্টেন বললেন, 'বলেছিলাম না তেমন কোনও ব্যাপার নয়। ও উবাঙ্গির খুব অনুগত। সেদিন জলদস্যুদের গুলিবৃষ্টির সময়ও এমনভাবে ওর মালিককে আড়াল করছিল যে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। কেউ কারো প্রতি অসম্ভব অনুগত না হলে তার জন্য ওভাবে জীবন বাজি রাখে না। তবে আপনাদের সঙ্গীকেও দোষ দিচ্ছি না। দুটো মানুষ অনেক সময় একইরকম দেখতে হয়। তাহলে কিন্তু আমরা আজ সন্ধ্যায় বন্দর ছাড়ছি।

হারবার মাস্টার বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি যাত্রা শুরু করতে পারেন। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। এরপর সেই জাহাজ থেকে নেমে পড়ল সবাই। লঞ্চে জেটিতে ফিরতে ফিরতে রেড্ডি সাহেব শিবরাজনকে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে তোমারই ভুল হয়েছে। ও তো চিনতেই পারল না তোমাকে। আর একটা ব্যাপার, লোকটাকে তোমার থেকে বয়সে অনেক ছোট বলেই মনে হল।' হারবার মাস্টার স্পষ্টতই অসন্তোষের সুরে বললেন, 'আমিও খেয়াল করেছি ব্যাপারটা। ও লোক কিছুতেই বয়সে বড় নয়। এসব ঘটনায় বন্দরের বদনাম হয়। শিবরাজনের চিঠিকে আমাদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত হয়নি।'

শিবরাজন কোনও কথার জবাব না দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল পিছনে সেই জাহাজটার দিকে।

জাহাজঘাটা থেকে সোজা বাড়িতে ফিরে এসেছিল সৃঞ্জয়। কিন্তু বিকেলবেলা আর একটা ফোন। এবার ফোনের ওপাশ থেকে এল শিবরাজনের গলা,—'স্যার, আমি অনেক কষ্টে ফোন নম্বর জোগাড় করেছি, আমাকে দয়া করে একবার সাহায্যে করুন। আর একবার কষ্ট করুন আমার জন্য। আপনার পায়ে ধরি স্যার...'

'কী সাহায্য?' জানতে চাইল সৃঞ্জয়।

'আমি শেষ একবার জেনে নিতে চাই সে আমার দাদা কি না? নইলে সারা জীবন আমাকে এ প্রশ্নটা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। আমি কী এতই ভুল দেখছি? এমনকী কাটা আঙুলটাও মিলে যাচ্ছে! শেষ আর একটা ব্যাপার আমি জানতে চাই।'

'কী ভাবে সেটা জানা যাবে?'

শিবরাজন বলল, 'আমাকে ওরা জাহাজে উঠতে দেবে না। আমি বোটে করে আপনাকে জাহাজে নিয়ে যাব। আমার দাদার পিঠে একটা জড়ুল ছিল। আপনি শুধু দেখবেন লোকটার পিঠে তা আছে কি না?

সৃঞ্জয় প্রথমে তাকে নিরস্ত করার জন্য বলল, 'যদি জরুল থেকেও থাকে, সে তো চিনতেই চাইছে না তোমাকে। কোনও মানুষকে তো জোর করে আটকানো যায় না। আর জাহাজও তার মত পরিবর্তনের জন্য আটকানো যাবে না।

শিবরাজন বলল, 'কিছুই করতে হবে না স্যার। শুধু ওটা আছে কি না জানতে চাই। প্লিজ স্যার প্লিজ...। এরপর কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। অগত্যা শেষ পর্যন্ত সৃঞ্জয় রাজি হল তার কথায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

শীতের বেলা। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নেমেছে। কুয়াশাও নামতে শুরু করেছে। দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজগুলোর গায়ে একটা একটা করে আলো জ্বলতে শুরু করেছে। জেটিতে একটা বোট নিয়ে অপেক্ষা করছিল শিবরাজন। সৃঞ্জয় সেখানে পৌঁছোতেই সে তাড়াতাড়ি তাকে বোটে নিয়ে রওনা দিল সে-জাহাজের উদ্দেশ্যে। জোয়ারের জল ঢুকতে শুরু করেছে খাড়িতে। অন্য জাহাজগুলো থেকে কিছুটা তফাতে কুয়াশায় মাখামাখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারকানা নামের আফ্রিকান জাহাজটা। তারও আলো জ্বলে উঠেছে। কুয়াশা মাখা আলোতে জাহাজটা কেমন যেন ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। তারা যখন জাহাজটার কাছে পৌঁছোল তখন নোঙর তোলার তোড়জোড় চলছে। ক্যাপ্টেন তাদের দেখে একটু বিস্মিত ভাবে বললেন, 'আবার কী? সমস্যা তো মিটে গেছে। হারবার মাস্টার জাহাজ ছাড়ার অনুমতি দিয়েছেন।'

ক্যাপ্টেনের কথায় সৃঞ্জয় বলল, 'আমি শুধু দু-মিনিট মিস্টার উবাঙ্গির সঙ্গে কথা বলতে চাই। তারপরই জাহাজ থেকে নেমে যাব।'

ক্যাপ্টেন বিরক্তির সুরে বললেন, 'ঠিক আছে আসুন। সময় কিন্তু ওই দু-তিন মিনিটই পাবেন।'

সৃঞ্জয় একাই জাহাজে উঠল। একজন লোক তাকে পৌঁছে দিল উবাঙ্গির কেবিনে। দরজা খুলে সৃঞ্জয়কে দেখে উবাঙ্গি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আবার এসেছেন আপনি? কী ব্যাপার? জাহাজের ইঞ্জিন কিন্তু চালু হয়েছে। নোঙর উঠবে।'

সৃঞ্জয় বলল, 'বিরক্ত করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি সাহায্যে করলে সামান্য কৌতূহল মিটিয়ে চলে যাব।'

'কী কৌতূহল?

'আমি একবার বেকনের পিঠটা দেখতে চাই। একটা চিহ্ন আছে কি না দেখব। আপনাদের আটকাব না।'

সৃঞ্জয়ের কথায় কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন উবাঙ্গি। তারপর বললেন, ভিতরে আসুন।'

আলো জ্বলছে কেবিনে। দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল লোকটা। খসখসে চামড়া। অনেকটা অন্ধদের মতো সাদা চোখের মণি। মুখমণ্ডলেও কোনও অভিব্যক্তি নেই। যেন কাঠের তৈরি মুখ। একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। হাত দুটো বেশ লম্বা।

উবাঙ্গি তার উদ্দেশ্যে সেদেশের ভাষায় কিছু বললেন। তা শুনে পিছন ফিরে দাঁড়াল লোকটা। তারপর পিঠ থেকে জামাটা ধীরে ধীরে ওপরে তুলল। তার পিঠের চামড়া হাত-পায়ের থেকে আরও ফাটা ফাটা। কোঁচকানো, ফসখসে। হয়তো তার পিঠে এক সময় জরুল ছিল, এখন চামড়ার সঙ্গে উঠে গেছে। জরুলের চিহ্ন না দেখলেও সে-পিঠে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেল। দুটো গোল ফুটো। এমন ফুটো মানুষের শরীরে হয় নাকি? বিস্মিত সৃঞ্জয় বলে উঠল, 'ও দুটো কীসের দাগ?' প্রশ্ন শুনে একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল উবাঙ্গির ঠোঁটে। তিনি বললেন, 'জলদস্যুদের গুলির দাগ। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে গুলি লেগেছিল। জোর করে আটকে রাখলে কি ও আমাকে বাঁচাতে ঝাঁপাত? এবার যান।'

আর কোনও কথা না বলে সৃঞ্জয় বেরিয়ে এল কেবিন থেকে।

সৃঞ্জয় জাহাজ থেকে বোটে নামার সঙ্গে সঙ্গে নোঙর উঠে গেল। শিবরাজন উৎকণ্ঠিত ভাবে বলে উঠল, 'কী দেখলেন?'

সৃঞ্জয় জবাব দিল, 'ঠিক বুঝতে পারলাম না। তখন তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে তার দেখা গুলির ফুটো দুটো। জেটির দিকে রওনা দিল বোট। আর তারকানাও কুয়াশা মাখা সমুদ্রে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

বাড়ি ফিরে এসে সৃঞ্জয়ের হঠাৎ মাথায় এল বন্ধু লুও তানার কথা। সে তো মালিন্দিতেই থাকে। হয়তো সে শিবরাজনের দাদার কোনও খোঁজ দিতে পারে, বা এই অদ্ভুত ব্যাপারের নিষ্পত্তি ঘটাতে পারে? ব্যাপারটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই পুরো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সমেত লুও তানাকে মেল করতে বসল কম্পিউটার খুলে।

৩

সপ্তাহ তিনেক সময় লাগল মেলের জবাব আসতে। লুও তানার চিঠিটা এইরকম—

প্রিয় সৃঞ্জয়,

তোমার চিঠির সূত্র ধরে ও তোমার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা করে আমি উক্ত মুরুগান নামক ব্যক্তির সন্ধান করেছিলাম। তার সম্বন্ধে কী জানতে পেরেছি তা বলার আগে কয়েকটা ঘটনার কথা বলব। যার সঙ্গে তোমার অভিজ্ঞতার হয়তো মিল আছে—

প্রথমবার এই ঘটনা খবরের কাগজের নজরে আসে প্রায় একশো বছর আগে ১৯১৮ সালে। আফ্রিকাতো বটেই, ইউরোপেরও সব কাগজে বেরিয়েছিল সে ঘটনা। ক্লাম্বেয়ার নামে এক শ্বেতাঙ্গ কিনিয়াতে তার আখ খেতে বসন্তকালে আখ কাটার জন্য নিয়োগ করলেন একদল কর্মঠ কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক। দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করত তারা। বিশ্রাম দেওয়া হত না। থামলেই চাবুক। খামারের বাইরে তাদের আসতে দেওয়া হত না। একদিন আশেপাশের গ্রামের মানুষরা আবিষ্কার করল সেই মানুষরা তাদের পরিচিত! তারা কেউ তাদের বাবা, দাদা, ভাই বা আত্মীয়। পুরো দলটাই বছর খানেক আগে উগান্ডায় গেছিল কাজ করতে। তারা হঠাৎ ওই আখ খামারে হাজির হল কী ভাবে? শেরিফকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামবাসীরা হাজির হল খামারে। কিন্তু সেই মজুররা গ্রামবাসীদের চিনতে অস্বীকার করল। আখ কাটার মরসুম শেষ হলে হঠাৎ! আবার হারিয়ে গেল সেই মজুরের দল।

এর পরের ঘটনা মোজাম্বিকের। ১৯৭০ সাল। ২০ বছর পর বাবা সাক্ষাৎ পেল তার ছেলের। সে ছেলে কথা বলতে পারে না তখন। বাবাকে চিনতেও পারছে না। সর্বাঙ্গে তার শুকনো ক্ষতচিহ্ন। জঙ্গলে এক সময় হারিয়ে গেছিল সে। ছেলে পাগল হয়ে গেছে ভেবে বাবা তাকে ঘরে নিয়ে এল। তিনমাস ঘরে ছিল সে। কিন্তু সে তিনমাসে একদানা খাবার স্পর্শ না করেও দিব্যিই একই রকম ছিল। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল। এমন আরও ঘটনা আছে। তবে শিবরাজনের মতো একটা শেষ ঘটনা বলি। ১৯৮০ সালে সুদানের খার্তুমে এক ফল বিক্রেতা আবিষ্কার করল তার ভাইকে। তার পরনে ছেড়া পোশাক। সারা গায়ে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন, নির্বাক শূন্য দৃষ্টি। যথারীতি সেও চিনতে পারছে না তার দাদাকে। এক্ষেত্রে তার দাদা সরাসরি দাবি করে বসল যে সে তার ভাইকে ১৫ বছর আগে নিজের হাতে কবর দিয়েছে। বসন্ত রোগে মারা গেছিল 'নার্সেই' নামে তার এই ভাই। নার্সেই সেদিন সন্ধ্যায় আবার ফলবাজার থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। প্রথম দুটো ঘটনার ক্ষেত্রেও পরবর্তীকালে জানা যায় প্রথম ঘটনার শ্রমিকের সেই দলটি তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে উগান্ডাতে এক দুর্ঘটনায় মারা যায়। আর সরকারি নথি অনুসারে সেই হতভাগ্য পিতার ছেলেকে পিতা-পুত্রর সাক্ষাতের অনেকদিন আগে সিংহ টেনে নিয়ে গেছিল। তার সাক্ষীও আছে।

বেশ অদ্ভুত ব্যাপার তাই না? মৃত মানুষরা ফিরে এল কীভাবে? এর একটা ব্যাখ্যা আছে। আফ্রিকায় এক ধরনের ওঝা বা জাদুকর আছে যারা ব্ল্যাক ম্যাজিকের চর্চা করে। যাদের বলা হয় ভুডু। এই ভুডু জাদুকররা নাকি মৃত মানুষদের কবর থেকে তুলে সে-দেহে প্রাণসঞ্চার করতে পারে মন্ত্র বা ইচ্ছা শক্তির দ্বারা। ওই জ্যান্ত- মড়াদের বলে জোম্বি। তাদের কোনও নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি বা ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। ভুডু জাদুকরের আজ্ঞাবহী দাস হিসাবে জোম্বিরা কাজ করে। জোম্বিদের এক অর্থে বলা যায় 'প্রেতশ্রমিক।' আবার অনেকে বলে যে ভুডু জাদুকররা জীবন্ত মানুষকেও অনেক সময় জোম্বি বানায়। যাকে জোম্বি বানানো হবে তাকে এক ধরনের পাউডার খাওয়ানো হয়। যাতে থাকে ব্যাঙ, পাফার মাছের নিঃসৃত রস ও আরও জরিবুটি। যা খেলে সে লোকের ইচ্ছাশক্তি লোপ পায় ও সে জাদুকরের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়। সেও জ্যান্ত মড়া জোম্বিতে রূপান্তরিত হয়। মড়া জ্যান্ত হবার ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিকরা আমল না দিলেও জোম্বির ব্যাপারটা কিন্তু চার-পাঁচশো বছর ধরে আফ্রিকার লোকজন বিশ্বাস করে আসছে। তুমি ব্যাপারটা বিশ্বাস না করলেও তাদের বিশ্বাসের সূত্র ধরে বলি তোমাদের সঙ্গে যার সাক্ষাৎ হয়েছিল হয়তো বা সে একজন জোম্বি। জ্যান্ত মড়া। পরিশেষে বলি, তোমার সেই মুরুগানের কথা। কিকুই ভিলেজ নামে আমাদের এখানকার ছোট শহরটার শেরিফ সরকারি নথি ঘেটে আমাকে জানিয়েছেন যে শিবরাজন নামে লোকটা শেষ যে চিঠি পেয়েছিল তার দাদার কাছ থেকে সে তারিখের কিছুদিন পরই মুরুগান নামের এক ভারতীয় শ্রমিকের মৃত্যু হয়। শনাক্তকরণ চিহ্ন হিসাবে তার পিঠে একটা জড়ুল ছিল। কিকুইতেই তাকে কবরস্থ করা হয়। কাজেই...

শুভেচ্ছা সহ, তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু।
লুও তানা
মালিন্দি, কিনিয়া।

চিঠিটা পড়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সৃঞ্জয়। যার সঙ্গে তার দেখা হল সে কি পুনঃজীবিত মৃতদেহ নাকি ইচ্ছাশক্তিরোহিত কোনও জীবন্ত জোম্বি? জড়ুলের দাগ না থাকলেও শিবরাজন কি এত ভুল করল? আঙুলও তো কাটা ছিল সে লোকটার! হঠাৎই সৃঞ্জয়ের মনে পড়ে গেল লোকটার পিঠটা। বুলেটের অমন ক্ষত নিয়ে কি কোনও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে? শেরিফ তো জানিয়েছেন মুরুগান মারা গেছে! তাহলে প্রথমটাই হয়তো সত্যি।

ঠিক এই সময় ঘটনাচক্রে মিস্টার রেডিডর একটা ফোন এল সৃঞ্জয়ের কাছে। কুশল বিনিময়ের পর তিনি বললেন, 'আপনাকে একটা খবর জানাই। সেই যে তারকানা নামের জাহাজটাতে আমরা গেছিলাম, আফ্রিকা উপকূল থেকে একশো কিমি দূরে অগ্নিকাণ্ডে সেটা ধ্বংস হয়েছে বলে খবর এসেছে। সেই উবাঙ্গি আর তার বেকন নামের ভূত ছাড়া সবার সলিল সমাধি ঘটেছে। বেকন নাকি তার মালিককে পিঠে নিয়ে একশো কিমি সাঁতরে উপকূলে ওঠে! অবিশ্বাস্য ব্যাপার তাই না?'

কথাটা শুনে সৃঞ্জয় অস্পষ্টভাবে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য ব্যাপার— জোম্বি!'

তোমরা বলছ

চটপট চিঠি পাঠানো যায় ই-মেলে patrabharati@gmail.com

কিশোর ভারতী

ধ্রুব বাচস্পতি

জয়দেব সাহা মালদা

কিশোর ভারতী'র ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটিতে প্রকাশিত কৌশিক মজুমদারের 'ঈশ্বরের সংখ্যামালা ও এক ইহুদি' নিবন্ধটির জন্য ধন্যবাদ। একজন ভালো ক্রিকেটারকে আমরা প্রত্যেকে চিনি। অথচ এমন একজন গণিতজ্ঞ (ট্রাস্টেনবার্গ) যাঁর আবিষ্কারের জন্যই আজকের অর্থনীতি নতুন গতির স্পর্শ পেয়েছে, তিনি যখন অগোচরেই থেকে যান তখন সেটি সবচেয়ে দুঃখজনক হয়ে ওঠে। এই নিবন্ধটিতে যেভাবে ট্রাস্টেনবার্গকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা হয়েছে সেটি সত্যিই অসাধারণ এবং গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই। এরকম আরও ব্যক্তিদের প্রকাশ্যে আনার অনুরোধ জানাচ্ছি।

তপনকুমার বৈরাগ্য
সাহাজাদপুর, নাদনঘাট, বর্ধমান

ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সবচেয়ে মূল্যবান রচনা 'বিশ্বের বিচিত্র উপজাতি'। বিশ্বের উপজাতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। 'টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ অভিযান', 'কাদের হাতে উঠবে কাপ?', 'স্মৃতির আঙিনায়' মূল্যবান রচনা। হরে কর কম বিভাগ নেই কেন? 'হরে কর কম' বিভাগ না থাকলে পত্রিকার মান ঠিকমতো থাকে না। হরে কর কম বিভাগ তুলে দেবেন না।

বন্ধুরা, দারুণ দারুণ এবারের চিঠি। জয়দেব সাহাকে ধন্যবাদ। নতুন চিঠি প্রেরক নুরজামান এবং প্রাপ্তিকেও অনেক শুভেচ্ছা। তোমাদের মতামত নিশ্চয়ই বিবেচনা করব। তপন, 'হরে কর কম' উঠে যায়নি। মার্চ সংখ্যা থেকে এল নতুন চেহারায়। ভালো থেকো।

প্রদীপ সাহা বিধানপল্লী, বর্ধমান

কিশোর ভারতীর ফেব্রুয়ারি সংখ্যা সম্পাদকীয়তে বাবার সঙ্গে ত্রিদিববাবুর হাতেখড়ির কাহিনিটি বেশ মর্মস্পর্শী। কিশোর ভারতীর প্রচ্ছদ কাহিনিগুলো এতটা মনোগ্রাহী ও লোমহর্ষক লাগে—ওই কাহিনিগুলো একটি আলাদা সংকলন আকারে দেখতে ইচ্ছে করে। গৌর বৈরাগীর 'ছায়া চুরি' গল্পটি হাস্যকর হলেও যুক্তিযুক্ত। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে চক্রধরের মতো সম্পাদকের যে আষ্টেপৃষ্টে নাছোড়বান্দা লেখকের চক্রব্যূহে আটকে পড়তে হয়—তা কাহিনিতে বেশ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর গোস্বামীর গল্পটি খুব সাবলীল ভাষাতে উপস্থাপিত! গল্পটিতে বাবার তত্ত্বাবধানে অম্বুদ যে ভাবে শিক্ষায় মনোনিবেশ করল—তা ভীষণভাবে মনে দাগ কাটল। 'ওর সামনে ভিডিয়ো গেমসের স্ক্রিন জুড়ে একটা ছেলের প্রাণপণ হার্ডল রেস। পাহাড়-পর্বত-খাদ...একচুল ভুল হলেই মৃত্যু'—এই পঙক্তির মধ্যেই মোহনানন্দ গুপ্তের গল্পের তাৎপর্য লুকিয়ে আছে! ক্ষুদ্র পরিসরে অনেক কিছু বললেন গল্পকার গল্পটিতে। অভিজ্ঞান রায়চৌধুরীর গল্পে বিজ্ঞানী মিঃ পাই এমন এক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন যা দিয়ে প্রতিবাদী সত্তা জাগিয়ে তোলা যায়—বাস্তবেও যদি তা সম্ভব হত তাহলে বেশ হত! ইন্দ্রনীল সান্যালের গল্পটি বেশ উচ্চমানের! কিশোর ভারতী প্রগতির পথে এগিয়ে চলুক আপন ক্ষমতায়!

তন্ময় কুণ্ডু মধ্যমগ্রাম, কলকাতা ৭০০১৩০

প্রথমেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই সম্পাদক মহাশয় ও 'তোমাদের দপ্তর' বিভাগের পরিচালক আনন্দবর্ধন মহাশয়কে, আমার কবিতা দুটি ছাপার জন্য।

'কিশোর ভারতী'র ডিসেম্বর সংখ্যা, এককথায় অনবদ্য। 'তেঁনাদের ঠিকানা' প্রচ্ছদ কাহিনিটি অসাধারণ।

'অভিনব গল্পের সিরিয়াল' জমে উঠেছে। 'তোমাদের দপ্তর'-এ কি নিয়মিত কবিতা পাঠানো যায়? এ ছাড়া কি আর কবিতা পাঠানো যায় না?

শ্রী সাধনচন্দ্র সরকারের প্রয়াত কন্যা, সোহিনী সরকারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই।

'কিশোর ভারতী' আরও এগিয়ে চলুক ও আমাদের মতন সবাইকে উৎসাহিত করুক।

নুরজামান শাহ হুদা হেরামপুর, মুর্শিদাবাদ

'কিশোর ভারতী' ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটি পড়লাম। প্রথমেই পড়ে ফেললাম 'আমাদের কথা'। সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাবাকে নিয়ে ছেলেবেলার মর্মস্পর্শী স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। সত্যি মনটা ভরে গেল এমন টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো পড়ে। এছাড়াও প্রচ্ছদকাহিনি 'বিশ্বের বিচিত্র উপজাতি' লেখাটি খুব ভালো লাগল। অনেক অজানা তথ্য জানলাম। প্রত্যেক সংখ্যায় নারায়ণ দেবনাথের 'নন্টে-ফন্টে' পড়ে খুব আনন্দ পাই। এ ছাড়া 'সোনার সাগর রহস্য', 'কিছু মেঘ, কিছু কুয়াশা' পড়তে ভালো লাগছে।

প্রাপ্তি মুখোপাধ্যায় নবম শ্রেণি, মেরী ইম্যাকুলেট স্কুল, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

আমি কিশোর ভারতীর এক নিয়মিত পাঠিকা। কিশোর ভারতী আরও এগিয়ে যাক, এই কামনা করে আমার কয়েকটি মতামত জানাতে চাই। আশা করব ধ্রুব বাচস্পতি মহাশয় ধৈর্য সহকারে আমার চিঠিটা পড়বেন।

প্রথমত বলতে চাই যে কিশোর ভারতী রঙিন হয়ে খুব ভালো লাগছে। গল্পের সিরিয়াল 'কিছু মেঘ, কিছু কুয়াশা' জমে উঠেছে। প্রত্যেক লেখকই জানেন গল্পের নতুন Twist কোথায় দিতে হয়!

নতুন ধারাবাহিক দীপান্বিতা রায়ের 'মিকিমোটো নেকলেস' প্রথম কিস্তি পড়ে ভালোই লাগল। আশা করছি আরও সুন্দর হবে ভবিষ্যতে। প্রচ্ছদ কাহিনিগুলো বেশ অন্যরকম; অনেক কিছু জানতে পারছি—লেখকদের ধন্যবাদ।

বিগত দুটি সংখ্যাতেই দেখলাম কয়েকজন পাঠক দোয়েল দত্তের ব্যোমকেশ বক্সির ওপর লেখা প্রচ্ছদটিতে ভুলগুলোর প্রতি আলোকপাত করেছেন। আমিও ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে কোনও বিষয়ের ওপর লেখার সময়ে তার সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়ে লেখা উচিত।

কমিক্স প্রসঙ্গে আসি। নারায়ণ দেবনাথের 'নন্টে-ফন্টে' ও জুরান নাথের 'বগলা অ্যান্ড কোং' এক কথায় অসাধারণ। জগুমামার নতুন কমিক্সটিও ভালো লাগছে। কিন্তু 'হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন'-এর ছবিগুলো ভালো লাগছে না।

গল্পের সম্পর্কে কিছু বলার নেই। কিন্তু পাঠিকা হিসেবে আমার এক অতিরিক্ত চাহিদা আছে—সুচিত্রা ভট্টাচার্য এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা কিছু নিখাদ মজার গল্প চাই।

অনেকদিন 'স্মৃতিধর'-এর মজার কাহিনি পড়িনি। আর ফেলুদা, ব্যোমকেশ, কিরীটি রায়ের মতো গোয়েন্দা কাহিনি কমিক্স বের করুন না পত্রিকায়! আর গ্রন্থকীট কিশোর-কিশোরীদের জন্য চলচ্চিত্রের ফেলুদা-ব্যোমকেশদের সাক্ষাৎকার দেওয়ার চেষ্টা করুন প্লি-ই-ই-জ! সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো সফল 'ফেলুদা' বা আবির চট্টোপাধ্যায়ের মতো সফল 'ব্যোমকেশ'-এর সঙ্গে পাঠকদের পত্রিকা মারফত পরিচয় হলে আমার মতো আরও অনেকেই কৃতার্থ হবে।

অনেকদিনের সঞ্চিত মতামত জানালাম। সব্বাই ভালো থাকবেন। কিশোর ভারতী যুগ যুগ জিও!

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার বিশ্বকাপ

রুনি মেসি রোনাল্ডো নেইমার
এ খেলায় ওরা কেউ নেই আর
ক্রিকেটে পালটে গেছে সব নাম
এইবারে ধোনি ক্লার্ক ম্যাকলাম।

কোহলি না আফ্রিদি ক্রিশ গেইল
ব্যাট হাতে দেখাবে কে বড় খেল?
জনসন ডেল-স্টেইন অশ্বিন
কে দেখাবে যাদু—পেস নাকি স্পিন?

ক্রিকেট বিশ্বকাপ উত্তাপ—
ব্যাটে বলে সব দলে বড় চাপ.
আমরা ও চাপ-টাপ মানি না
আমাদের ক্যাপ্টেন ধোনি না?

ভেবে দ্যাখো ফাইনাল গতবার
ছক্কা হাঁকিয়ে বল করে পার
এনে দিয়ে জয়টাকে বিলকুল
এখনও তো ধোনি মিস্টার কুল!

সঞ্জয় কর্মকার

জীবন

রাজা চায় রাজগদি
চাষি চায় কাস্তে,
শ্রমিকের উঁচু হাত
মাথা তুলে বাঁচতে।

মহাকাশ বিজ্ঞানী
ছুটে যায় শূন্যে,
ধর্মের পথচারী
লোভাতুর পুণ্যে।

নদী চায় বাধাহীন
মিশে যেতে মোহনায়,
প্রকৃতির কোল ভরে
মেঘ ভাঙা জোছনায়।

ফেলে যত বই-খাতা
শিশু চায় শৈশব,
জীবনের চাওয়া শুধু
খ্যাতি আর বৈভব।

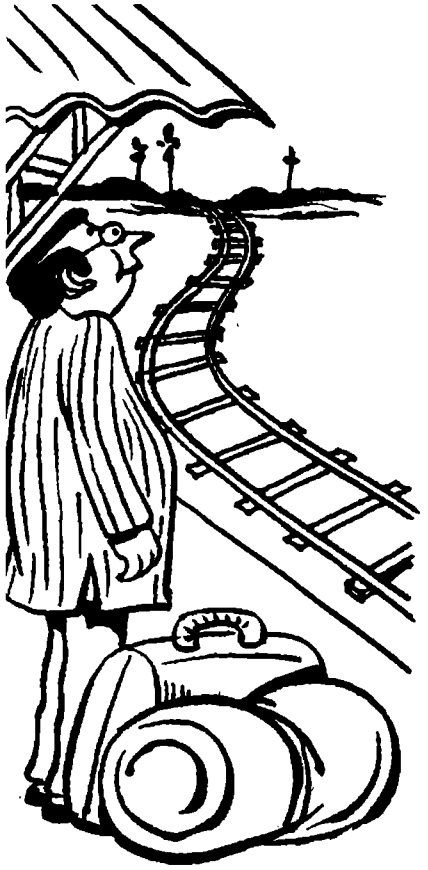

পার্থ সিন্‌হা

স্টিফেনসন

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি—সন্ধে সবে সাতটা
বিশেষ কাজে হাওড়া যাব, ট্রেনের তো নেই পাত্তা!
কী করি আর? দেখছি আকাশ, চাঁদ-জড়ানো মেঘ
রাতের সাথে বাড়ছে আমার মনেতে উদ্‌বেগ!
বেলপাহাড়ি রেল স্টেশনে লোক চলাচল কম
সন্ধে হলেই কেমন যেন গা করে ছম-ছম!
ইতি-উতি জ্বলছে আলো মধ্যিখানে আঁধার
পিছন থেকে কে যেন কয়, 'কোথায় যাবে ব্রাদার?'
তাকিয়ে দেখি একটা সাহেব, মুখ ঢেকে তার টুপি
অজ্ঞাত লোক ভেবে আমি দাঁড়িয়ে থাকি চুপ-ই!
বলল সাহেব 'আসছে যে ট্রেন, আর চড়ো না ওতে—
দেখছি সে-ট্রেন বিগড়ে গিয়ে আটকে যাবে পথে!'
'কেমন করে জানলে তুমি? প্রশ্ন করি যেই—
অমনি দেখি ডাইনে-বাঁয়ে সাহেব কোথাও নেই!
হাওয়ায় মিশে বলল সাহেব, 'আমার সৃজন মন
বানিয়েছিল রেলগাড়ি যে, আমিই স্টিফেনসন!'
নিষেধ শুনে ফিরে এলাম—পা চালিয়ে দ্রুত
পরের দিনে খবর পেলাম—ট্রেনটা লাইনচ্যুত!

ছবি জুরান নাথ

গল্প

রহস্য গল্প প্রতিযোগিতায় **প্রথম পুরস্কার** প্রাপ্ত গল্প

পিনাকী মুখোপাধ্যায়

বন্ধু দেখা হবে

রবিশঙ্কর আর আমার বন্ধুত্ব সেই ছেলেবেলা থেকে। একই স্কুল থেকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ভর্তি হয়েছিলাম একই কলেজে। অবশ্য আমাদের স্ট্রিম আলাদা ছিল। ওর সায়েন্স, আমার আর্টস।

আমি ছিলাম অত্যন্ত গরীব ঘরের ছেলে। বাবা ছিলেন না। সেলাইয়ের কাজ করে, বাড়িতে তৈরি আচার, বড়ি, জ্যাম প্রভৃতি বিক্রি করে অতি কষ্টে সংসার চালাতেন মা। তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল আমি যেন মন দিয়ে পড়াশুনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হই।

তাই সাধ্যের বাইরে গিয়েও আমাকে মা নামি স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের মধ্যে আমি ছিলাম একমাত্র ব্যতিক্রম। আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে থাকত আমার চেহারায়, পোশাকে। বন্ধুরা আমাকে পাত্তাই দিত না। অবজ্ঞার চোখে দেখত।

তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। একদিন অরিন্দম বলে একটি ছেলের সুন্দর একটা পেন ক্লাস থেকে হারিয়ে যেতে সকলে সন্দেহ করল আমিই সেটা চুরি করেছি। আমি বার বার অস্বীকার করলাম। কেউ বিশ্বাস করল না আমার কথা।

আমার স্কুলব্যাগ, ডেস্ক তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যখন পেল না, তখন ওরা আমার জামা, প্যান্ট ধরে টানাটানি শুরু করল।

লজ্জায়, দুঃখে জল এসে গিয়েছিল আমার চোখে।

ঠিক তখন নতুন ভর্তি হওয়া একটি ছেলে এসে রুখে দাঁড়াল আমাকে আড়াল করে। তারপর তারই তৎপরতায় প্রত্যেকের ব্যাগ সার্চ করতে করতে অরিন্দমের ব্যাগেই পাওয়া গেল পেনটা। একটা বইয়ের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল।

নতুন ছেলেটা বলল, গোটা ঘটনাটাই সে হেডস্যারকে জানাবে। সবাই ভয় পেয়ে গেল এবার। কাঁদো কাঁদো গলায় অরিন্দম জানাল সে ইচ্ছে করে এমন করেনি। সত্যিই সে খুঁজে পাচ্ছিল না কলমটা।

ডাকাবুকো সেই ছেলেটা তখন মামলার রায় ঘোষণা করার মতো বলেছিল, একটা শর্তেই সে হেডস্যারকে বিষয়টা জানাবে না। সবাইকে ক্ষমা চাইতে হবে আমার কাছে।

যারা কোনোদিন আমাকে মানুষ পদবাচ্য বলেই মনে করেনি, সেদিন তারাই বাধ্য হয়েছিল ক্ষমা চাইতে। আবেগে, খুশিতে, হয়তো কিছুটা লজ্জাতেও জল এসে গিয়েছিল আমার চোখে।

আমার আর রবিশঙ্করের বন্ধুত্বের সেই ছিল সূচনা। তারপর গঙ্গা গিয়ে

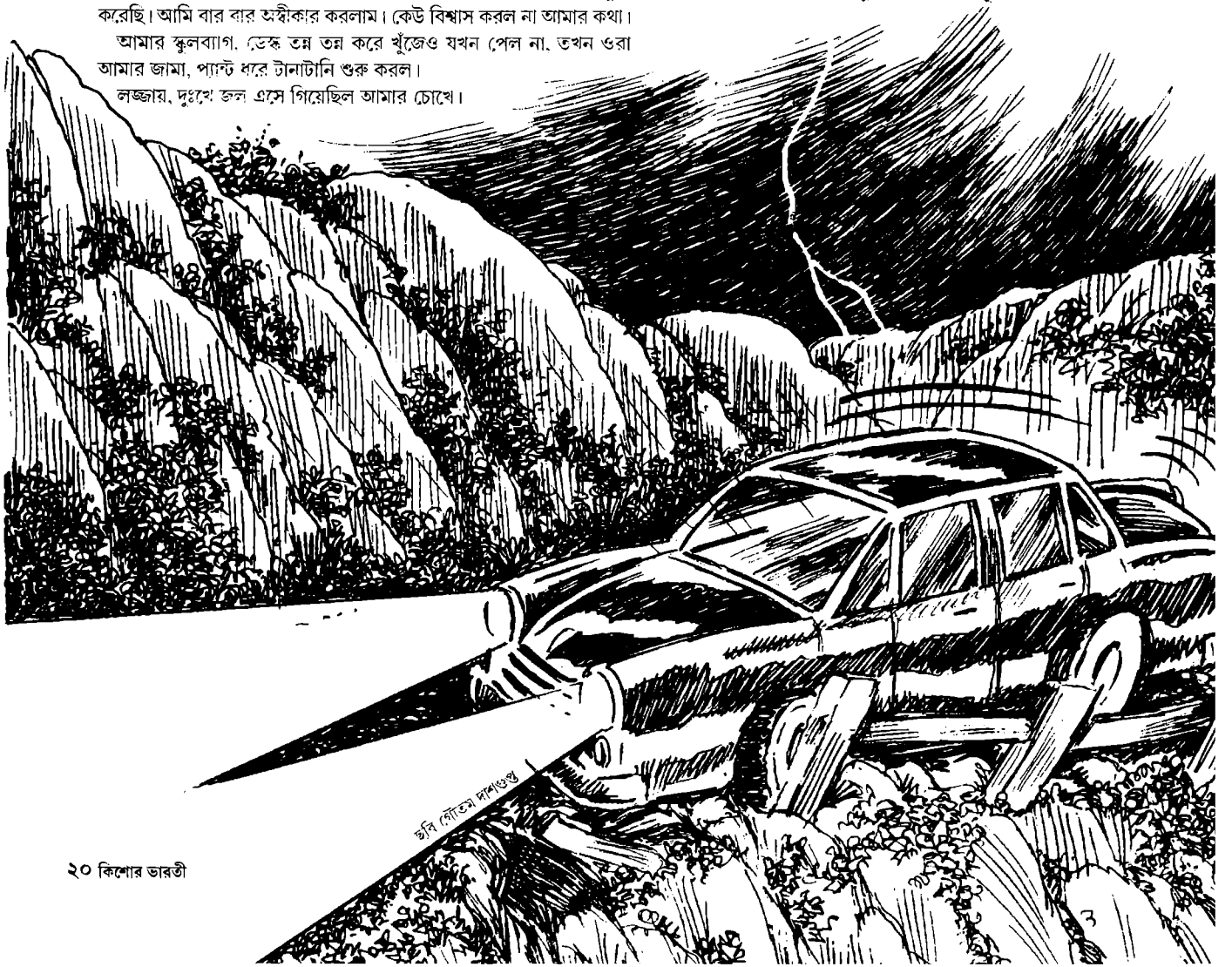

ছবি: গৌতম দাশগুপ্ত

গড়িয়ে গিয়েছে অনেক জল। দিনে দিনে আরও দৃঢ় হয়েছে আমাদের বন্ধুত্ব।

স্বভাবের দিক থেকে অনেক বৈপরীত্য ছিল আমাদের। আমি বরাবরই ভীতু গোছের। ভূত, প্রেত প্রভৃতিতে যেমন বিশ্বাস করি, তেমনি ঈশ্বরের ওপরেও গভীর ভাবে আস্থাশীল। অন্যদিকে রবিশঙ্কর ছিল প্রবলভাবে নাস্তিক, যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানমনস্ক। যাবতীয় ঘটনাই সে বিচার করত বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে। অতিপ্রাকৃতিক, আধিভৌতিক ব্যাপারস্যাপারে তার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না।

আমার এবং রবির অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট বরাবরই ভালো। গ্রাজুয়েশনের পর মূলত রবির প্রবল উৎসাহ এবং উদ্যোগেই আমি এম.এ.-তে ভর্তি হয়েছিলাম।

ইউনিভার্সিটির পড়া শেষ হওয়ার এক বছরের মধ্যেই রবিশঙ্কর ওয়েস্টবেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিসে ভালো চাকরি পেয়ে চলে গেল উত্তরবঙ্গের লাটাগুড়িতে। আর আমি কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে আরও এক বছর পরে কলকাতার একটি কলেজে যোগ দিলাম লেকচারার পদে। কর্মক্ষেত্রের দূরত্ব কোনওরকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে।

যাই হোক, কলেজে আমি যে বিষয় পড়াই সেটা হল মনোবিজ্ঞান। কিন্তু আমার বিশেষ একটা শখ আছে। সুপার ন্যাচারাল অথবা প্যারানর্মাল বিষয় আমাকে ভীষণ টানে। এই সংক্রান্ত কোনও বই পেলেই আমি তা গোগ্রাসে গিলি। আমার ড্রয়িংরুমের একটা আলমারি ভর্তি হয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র ওই ধরনের বইয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় সেসব পড়াশুনা করে।

রবি ঠাট্টা করে বলে, 'এইসব গাঁজাখুরি বইগুলো পড়ে তুই শুধু শুধু সময় নষ্ট করছিস বন্ধু। এমনিতেই তুই ভীতু। এসব পড়ে আরও ভীতু হয়ে যাবি।'

তর্কের সুরে আমিও বলি, 'গাঁজাখুরি বলছিস কেন?'

'তাছাড়া কী? সুপার ন্যাচারাল এগজিসটেন্স প্রমাণ করতে পারবি?'

'সবকিছুই কি ওভাবে প্রমাণ করা যায়? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক— এই পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয় দিয়ে জগতের যাবতীয় রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ এবং স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু এর বাইরে আরও একটি ইন্দ্রিয় আছে—অন্তরিন্দ্রিয় বা মন। অলৌকিক অস্তিত্বের উপলব্ধি আসে সেই মনের পথ ধরে। তুই দেখবি, এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে যার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তখন কিন্তু...'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রবি বলে ওঠে, 'তখন কী? কোনও ঘটনার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলেই সেটা অলৌকিক ঘটনা বলে মেনে নিতে হবে? সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা কিংবা সুনীল গঙ্গুলির কাকাবাবু তাঁদের অসাধারণ ক্যারিশমায় সব রহস্যের জট অবলীলায় খুলে ফেলতে পারলেও বাস্তবের গোয়েন্দাকর্তারা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই খুনের মোটিভ কিংবা খুনিকে শনাক্ত করতে পারেননি। তখন কি সেই ঘটনাগুলোকে তুই অলৌকিক বলে ব্যাখ্যা করবি?'

ওর অদ্ভুত যুক্তি শুনে আমি হতবাক। কীসের সঙ্গে কীসের তুলনা!

একবার রুডি রুকারের লেখা 'দ্য ফোর্থ ডাইমেনশন অ্যান্ড হাউ টু গেট দেয়ার' নামে একটা বই রবিকে দিয়ে বলেছিলাম, 'বইটা পড়ে দ্যাখ, অশরীরী অস্তিত্ব নিয়ে ভদ্রলোক যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা সত্যিই ভেবে দেখবার মতো।

'ওর মতে, অশরীরী অস্তিত্বগুলো ঘোরাফেরা করে আমাদের আশেপাশেই। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধ এই তিনটি মাত্রা বা ডাইমেনশন নিয়ে যে পৃথিবী, আমরা অবস্থান করি সেখানে। কিন্তু এই তিনটি মাত্রা ছাড়াও অন্য মাত্রা বা ডাইমেনশনও আছে। সেই ডাইমেনশনে কী হচ্ছে না হচ্ছে, তা কিন্তু অধরাই থেকে যায় আমাদের কাছে। যদি কোনওভাবে সেই অন্যতর ডাইমেনশনে চলে আসা যায়, তবেই মালুম হবে অশরীরী অস্তিত্ব।'

বইটা হাতে নিয়ে একটা সবজান্তা হাসি হেসে রবি বলেছিল, 'প্রেতচর্চাকে যাঁরা বিজ্ঞানচর্চা বলে প্রচার করেন, রুডি রুকার তো তাঁদের একজন, তাই না? শোন রঞ্জু, কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাস একান্তই তার নিজস্ব। কোনও বিজ্ঞানী ব্যক্তিগতভাবে ভূত, অশরীরী প্রভৃতি বিশ্বাস করতেই পারেন। তার অর্থই কিন্তু এই নয় যে বিজ্ঞান অশরীরী অস্তিত্ব স্বীকার করছে।'

রবিকে জব্দ করবার জন্য চালাকির আশ্রয় নিই আমি। আমি জানি, ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে। তাই বললাম, 'তুই কি জানিস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিশ্বাস করতেন পরলোকে? যদি না জেনে থাকিস তবে অমিতাভ চৌধুরীর লেখা, 'রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা' বইটা পড়ে দেখিস। কবির ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল ১৯০৭ সালে। ১৯২৯ সালে প্রথমবার কবি প্ল্যানচেটের মাধ্যমে কথা বলেছিলেন মৃত পুত্রের সঙ্গে। পরবর্তীকালে আরও ছ'বার বিভিন্ন সময়ে শমীন্দ্রনাথ এসেছিলেন কবির ডাকে। সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পরেও কবি প্ল্যানচেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। তারপরেও তুই বলবি পরলোক বলে কিছু নেই!'

একটু বুঝি থমকে যায় রবিশঙ্কর। প্রিয় কবির প্রসঙ্গ এসে পড়ায় যেন ফাঁপরে পড়ে গিয়েছে বেচারা।

কিন্তু হলে কী হবে? ভাঙলেও মচকাবার পাত্র নয় রবি। বলে ওঠে, 'পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে জলের গভীরতা কী করে মাপি বল তো? জল কতটা গভীর জানতে গেলে আমাকে তো জলে নামতে হবে। পরলোক বলে সত্যিই যদি কিছু থেকে থাকে, আমার পরলোক প্রাপ্তির পরেই সে ব্যাপারে কনফারমেশন দিতে পারব। অতএব তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে বৎস। বাই দ্য ওয়ে, তখন আমাকে দেখে আবার ঘাবড়ে যাবি না তো? যা ভীতু তুই!' বলেই ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হেসে উঠেছিল রবি।

ঠিক সেই সময় টিক টিক করে ডেকে উঠল একটা টিকটিকি। অজানা আশঙ্কায় ছ্যাৎ করে উঠল আমার বুকটা।

রবির ঝকঝকে, আত্মবিশ্বাসী সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা ভাবনা লহমার জন্য ছুঁয়ে গেল আমাকে। পরলোক, পুনর্জন্ম এসবে বিশ্বাস নেই রবির। কিন্তু আমার যে আছে। আমি কখনোই চাই না অশরীরী অস্তিত্বের প্রমাণ পেতে রবির পরলোক প্রাপ্তি ঘটুক। তার চেয়ে ওর অবিশ্বাসও অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত আমার কাছে। পুনর্জন্ম বিশ্বাস করি বলেই আমি চাই, একান্তভাবে চাই, বারে বারে, প্রতিটি জন্মেই যেন দেখা হয় আমাদের। আর কী জানি কেন, কী এক প্রগাঢ়তায় আমার অন্তরাত্মাও বলে ওঠে, হবে। হবে। বন্ধু দেখা হবে।

চাকরি পাওয়ার পরে কেটে গেল দুটো বছর। রবিশঙ্কর নিয়মিত কলকাতায় এলেও ওর কর্মস্থল লাটাগুড়িতে একবারও গিয়ে উঠতে পারিনি আমি। মাস দেড়েক আগে রবি যখন এসেছিল, খুব রাগ দেখিয়ে বলেছিল, এরপর আমি যদি লাটাগুড়িতে না যাই, তবে এটাই ওর শেষ আসা। আর আসবে না কলকাতায়।

ওর রাগ ভাঙাতে বাধ্য হয়েই কথা দিয়েছিলাম, এরপর আমিই যাব ওর কাছে। দরকার হলে কলেজ থেকে ছুটি নিয়েই যাব। তারপর যখনই ফোনে ওর সঙ্গে কথাবার্তা হত, ও মনে করিয়ে দিত আমার অঙ্গিকারের কথা।

কিন্তু বাস্তব হল, এখনো আমি সময় করে উঠতে পারিনি। সময় না পাওয়ার পেছনে শুধুই যে আমার ল্যাথার্জি কাজ করেছে, তা কিন্তু নয়। বিশেষ করে সপ্তাহ খানেক ধরে, সত্যিই আমার অন্য কিছু ভাবার সময় ছিল না। কারণ আমার সাদামাটা নিস্তরঙ্গ জীবনে ছোটখাটো সুনামির মতোই প্রায় একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল।

প্যারানর্মাল বিষয়ের ওপর লেখা আমার কিছু গল্প, প্রবন্ধ, কয়েকটি লিট্‌ল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হওয়ার পরে সাহস করে আমার একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলাম একটি নামি প্রকাশনা সংস্থার অফিসে। বেশ কয়েক মাস অপেক্ষা করার পরেও কোনও খবর না পাওয়ায় ধরে নিয়েছিলাম লেখাটি মনোনীত হয়নি। প্রায় ছ'মাস বাদে, যখন প্রায় ভুলেই গিয়েছি ঘটনাটা, তখনই এক দুপুরে সেই পত্রিকা অফিস থেকে ফোন করে জানানো হল, আমার লেখাটি নির্বাচিত হয়েছে এবং চলতি মাসের সংখ্যাতেই ছাপানো হবে। শুধু তাই নয়, আরও একটি লেখা পাঠানোর ফরমায়েশ করলেন ভদ্রলোক।

আমি বাকরুদ্ধ। এতটাই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে ধন্যবাদটুকুও জানাতে পারলাম না ঠিকমতো।

আনন্দটা কিছুতেই যেন ধরে রাখতে পারছিলাম না নিজের মধ্যে। রবিকে খবরটা দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। তখনই খেয়াল হল অনেকদিন ফোন করেনি রবি। আর এই ক'দিন নতুন লেখা নিয়ে এতই বুঁদ হয়েছিলাম, ওকে ফোন করার কথাটাও মনে পড়েনি। নিজের কাছে নিজেই কেমন ছোট হয়ে গেলাম আমি। আর সময় নষ্ট না করে তৎক্ষণাৎ ফোন করলাম ওকে। ফোন সুইচড্ অফ। অবাক হলাম। এমন তো হয় না কখনো। ঘণ্টা খানেক পরে আবার ফোন করলাম। তারপর সারাদিনে কতবার যে করলাম ঠিক নেই।

শুধু সেদিন নয়, তারপর দিন, তারপরের দিনও একই ব্যাপার। যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর একঘেয়ে সুরে বারবার বলে গেল একই কথা—যে নম্বরটির সঙ্গে যোগাযোগ

করতে চাইছেন, সেটি আপাতত বন্ধ আছে...।

লেখা ছাপা হওয়ার আনন্দ, উত্তেজনা নিঃশেষ হয়ে গিয়ে গভীর উৎকণ্ঠায় ভয়ে গেল আমার মন।

সেদিন সন্ধেবেলায় রবির খবর নিতে হাজির হলাম ওদের ভবানীপুরের বাড়িতে। গিয়ে দেখলাম রবির ব্যাপারে কারো কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। রবির সৎভাই, যে এখন ওদের ব্যবসা দেখাশুনা করে, রুক্ষ স্বরে বলল, 'দাদা তো আমাদের সঙ্গে যোগাযোগই রাখে না। ওর খবর কী করে জানব বলুন তো?'

একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম, 'আজ ক'দিন ধরে ওকে ফোনে পাচ্ছি না। তাই...।

'নর্থবেঙ্গলে এত ঝড়, বৃষ্টি হচ্ছে, হয়তো টাওয়ারে প্রবলেম হচ্ছে। তাই জন্য এত উতলা হওয়ার কী আছে?'—কেমন ব্যঙ্গের মতো শোনাল ওর ভাইয়ের কথাগুলো।

আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এলাম ওদের বাড়ি থেকে।

বাড়িতে ফিরে ক্লান্ত শরীরটা সোফায় ছেড়ে দিয়ে আনমনেই অন করে দিলাম টিভি-টা। খবর হচ্ছে। অন্যমনস্কভাবে খবর শুনতে শুনতে সহসাই সজাগ হয়ে উঠল কানদুটো।

শুনলাম উত্তরবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলে এক অজানা জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। চিকিৎসকরা এখনো সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারেনি রোগটিকে। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা চলছে বটে, তবে চিকিৎসা শুরু হতে সামান্য দেরি হলেই রোগটি ডাক্তারদের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। আতঙ্কিত মানুষজন এলাকা ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছে।

আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। কারণ যে অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়েছে রোগটি, তার মধ্যে লাটাগুড়ির নামও রয়েছে। জানি না কেন, আমার মন কু-ডাকতে লাগল। চেষ্টা করেও সমে আনতে পারছি না মনটাকে।

মনে হতে লাগল কিছু একটা ঘটতে চলেছে, যা অভিপ্রেত নয়, কাঙ্ক্ষিত নয়।

পরদিন ফার্স্ট আওয়ারেই যোগাযোগ করলাম রবিদের কলকাতার হেড অফিসে। আমার আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণিত করে এক ভদ্রলোক জানালেন, লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার রবিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে বেশ কিছুদিন ধরেই ছুটিতে রয়েছেন। অসুস্থতা কতটা গুরুতর সে ব্যাপারে অবশ্য কিছু জানাতে পারলেন না ভদ্রলোক। সেই মুহূর্তেই আমি লাটাগুড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

পরদিন ছিল শনিবার। মা বললেন, 'শনিবার দিনটা বাদ দিয়ে গেলে হত না?'

আমি বললাম, 'আমার ভালো লাগছে না মা। মনে হচ্ছে একটা দিন দেরি হলেও অনেক দেরি হয়ে যাবে। না কি অলরেডি দেরি হয়েই গিয়েছে, কে জানে? হয়তো রবিকে... আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

রিজার্ভেশন পাওয়ার প্রশ্ন ছিল না। সাধারণ টিকিট কেটে চড়ে বসলাম এন.জে.পি. গামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে ছাড়ল ট্রেনটা। এন.জে.পি. পৌঁছোনোর রাইট টাইম সন্ধে ৬টা ২০ মিনিটে। ভাবলাম ৭টার মধ্যেও যদি পৌঁছে যাই, একটা গাড়ি ভাড়া করে মোটামুটি ৯টার মধ্যেই ঢুকে যাব লাটাগুড়িতে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর কিছু। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে যখন ট্রেনটা এন.জে.পি. স্টেশনে ঢুকল তখন রাত ১১টা ৩৫। প্ল্যাটফর্ম থেকে বিরাট লম্বা ওভারব্রিজ পার হয়ে স্টেশনের বাইরে এলাম।

এই দুর্যোগের রাতে কোনও ড্রাইভার রাজি হল না লাটাগুড়িতে যেতে। হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কালো বর্ষাতি, টুপি পরা একটা রোগাটে লম্বা লোক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে আমার সুটকেসটা হাতে নিয়ে বলল, সে আমাকে লাটাগুড়িতে নিয়ে যাবে, ৫০০ টাকা বেশি দিতে হবে।

রাজি না হয়ে কোনও উপায় নেই। ওর পিছু পিছু এসে বসলাম গাড়িতে। গাড়িটা চলতে শুরু করার একটু পরেই মনে হতে লাগল, রাজি না হলেই বোধহয় ভালো হত।

প্রচণ্ড স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে লোকটা। নিউ জলপাইগুড়ির জনপদ ছাড়িয়ে কখন যে এসে পড়লাম জনহীন জঙ্গলের রাস্তায় বুঝতেই পারলাম না। চমকে ওঠা বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম রাস্তার দু'ধারে গভীর জঙ্গল। ঝোড়ো হাওয়ায় দৈত্যাকৃতি গাছগুলো এমন বীভৎসভাবে দুলছে যেন যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়বে গাড়ির ছাদে। খানা-খন্দে ভরা অমসৃণ পথে বার বার ভয়ঙ্করভাবে লাফিয়ে উঠতে লাগল গাড়িটা। সভয়ে বলে উঠলাম, 'একটু আস্তে চালান না ভাই গাড়িটা।'

আমার মিনমিনে কণ্ঠস্বর লোকটার কানে গেল কি না বুঝতে পারলাম না। কারণ গাড়ি ছুটতে লাগল একই গতিতে। স্টিয়ারিং ধরে মূর্তির মতো বসে আছে লোকটা। গলা খাঁকরানি দিয়ে আমি গলায় আর একটু জোর এনে বলে উঠলাম, 'গাড়িটা আস্তে চালান। অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে যে।'

মনে হল আমার কথাগুলো শুনতে পেয়েছে লোকটা। আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল আমার দিকে। অন্ধকারে ওর দাড়ি-গোঁফ ভর্তি মুখেও কোনও অভিব্যক্তি ফুটল কি না বুঝতে পারলাম না আমি। কিন্তু ওর সবুজ মণিওয়ালা অদ্ভুত চোখ দুটোর মধ্যে এমন কিছু ছিল যা দেখে আমার শরীরটা ছমছম করে উঠল। ওর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাতেই আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

দেখলাম, জঙ্গলের ধার ঘেঁষে ভীষণ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে সামনের পথ। একদিকে গভীর জঙ্গল, অন্যদিকে খাদ। প্রাণভয়ে চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'সাবধান'! সামনে খাদ।...'

মনে হল, জীবনের অস্তিমলগ্ন সমাগত। মা আর রবির মুখটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। এ জীবনে আর বুঝি দেখা হল না রবির সঙ্গে।

প্রচণ্ড শব্দে চরাচর কাঁপিয়ে যেন বজ্রাঘাত হল। দুহাতে চোখ ঢেকে ফেললাম আমি। গভীর খাদের অতলেই বুঝি তলিয়ে যাচ্ছি...।

কতক্ষণ? যেন বহুক্ষণ চোখ বন্ধ করে আছি। খুব ধীরে ধীরে চোখ থেকে হাত সরালাম। কিন্তু এ কী.? কোথায় খাদ? পিচঢালা রাস্তা ধরে ছুটছে গাড়িটা; তবে কি অন্ধকারে উঁচু-নীচু পথে গাড়ির আলো পড়ে অমন বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছিল?

দেখলাম, তেরছা চোখে লোকটা লক্ষ করছে আমাকে। ওর দাড়ি-গোঁফের আড়াল থেকে ছিটকে আসছে হাসি। এবড়ো-খেবড়ো দাঁতগুলো বের করে হাসছে লোকটা। একটু লজ্জা পেলাম আমি। তারপর আমিও হেসে ফেললাম।

লাটাগুড়ি রেঞ্জ অফিসের সামনে যখন এসে দাঁড়ালাম তখন গভীর রাত। দুর্যোগের কারণেই বোধহয় বন্ধ বিদ্যুৎ পরিষেবা। কমপ্লেক্সের বিশাল লোহার গেটে স্বাভাবিকভাবেই তালা পড়ে গিয়েছে।

'কে আছ? গেটটা খোলো।' বলে উঠলাম আমি। ঝড়-বৃষ্টির শব্দে মিশে গেল আমার কণ্ঠস্বর। কেউ এল না।

সজোরে গেটটা ঝাঁকিয়ে আবার বললাম কথাগুলো। আমাকে অবাক করে খুলে গেল তালাটা। তবে কি লাগানো ছিল না ঠিকমতো?

সামনের নুড়ি বিছানো পথ ধরে এগোতে লাগলাম। অদূরেই একটা বাংলো বাড়ি। বন্ধ জানলার ফাঁক গলে চোখে পড়ল মৃদু আলোর আভাস।

তিন ধাপের সিঁড়ি পেরিয়ে বারান্দায় উঠতেই নজরে এল একটা কালো কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে দরজার সামনে। হঠাৎ মুখ তুলে চাইল কুকুরটা। জ্বল জ্বল করে উঠল ওর চোখ দুটো। বিকট চিৎকার করে ককিয়ে উঠল কুকুরটা। আমি নিস্পন্দ। ঠিক তখনই যেন কেউ তাড়া করেছে এই ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে, বিশ্রী শব্দ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল কুকুরটা। শুধু ওর কান্নাটা একটা অশুভ ইঙ্গিতের মতো প্রতিধ্বনিত হতে লাগল থেকে থেকে।

বন্ধ দরজা কখন খুলে গিয়েছে। দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রবি। ঘরের ভেতরে জ্বলছে একটা হ্যারিকেন। আলো-আঁধারি অস্পষ্টতায় কেমন অচেনা লাগছে রবিকে।

কেমন একটা ফ্যাঁসফেসে গলায় ও বলে উঠল, 'তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম রঞ্জু। আমি জানতাম তুই আসবি। কিন্তু বড্ড দেরি করে এলি তুই। জ্বরের ঘোরে বারবার খুঁজেছি তোকে। বার বার ডেকেছি তোর নাম ধরে। কিন্তু...' কথা বলতে বলতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে রবি।

একটা বিজাতীয় অনুভূতির জাল একটু একটু করে ঘিরছিল আমাকে। রবিকে বুঝতে না দিয়ে দু-পা পিছিয়ে গেলাম।

তারপর ব্যস্তভাবে বলে উঠলাম, 'আমার জামাকাপড় সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছে রবি। আগে এগুলো ছাড়ি। তারপর কথা হবে।'

একটু যেন থমকে গেল ও। হালকা ভাঁজ পড়ল ওর ভুরুতে। ভুল দেখলাম কি না জানি না। মনে হল পলকের জন্য যেন জ্বলে উঠল ওর চোখদুটো। ও কোনও কথা না বলে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে।

সহসাই যেন শীতল নৈঃশব্দ ভারী করে তুলল ঘরের বাতাস। আমার কাছে দুঃসহ মনে হল সেই শব্দহীনতা। মনে হল, যেভাবেই হোক কথা চালিয়ে যেতে হবে।

সেই অভিপ্রায়ে কিছু বলবার আগেই শুনতে পেলাম রবির হিমশীতল কণ্ঠস্বর, 'তোর মনে আছে রঞ্জু, একসময় আমাকে অশরীরী অস্তিত্ব বিশ্বাস করানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলি তুই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। তোকে বলেছিলাম পরলোক প্রাপ্তির পরে যদি কখনো কনফার্ম হতে পারি তবে ফিরে আসব তোর কাছে। জানিয়ে যাব আমার বিশ্বাসের কথা। মনে আছে তোর রঞ্জু?'

ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে আমার। এই প্রসঙ্গ একটুও ভালো লাগছিল না। বললাম, 'বাদ দে তো ওসব কথা। তুই ফোনটা বন্ধ করে রেখেছিলি কেন বল তো?'

'ইচ্ছে করেই। ফোনেই যদি জেনে যেতিস আমার খবর তবে কি এভাবে ছুটে আসতি? আর তুই না এলে আমি কী করে জানাতাম আমার বিশ্বাসের কথা? তিন মাত্রার পৃথিবী পার হয়ে না এলে অন্য মাত্রাগুলোর খোঁজ যে পাওয়া যায় না সেটা...'

কেঁপে উঠলাম আমি। ওর কথাগুলো শুনতে একটুও ইচ্ছে করছে না আমার। ওকে থামাতে ওর কথার মাঝখানেই চিৎকার করে বলে উঠলাম, চুপ কর। প্লিস চুপ কর। এসব কথা একটুও ভালো লাগছে না আমার।

ও হেসে উঠল। ওর অট্টহাসিতে যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বাংলো বাড়ির দেওয়ালগুলো। বড়সড় একটা ছন্দপতনের আভাস জুড়েই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

রবি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। মা ছাড়া এত আপন আর কেউ নেই আমার এই বিশ্ব সংসারে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে আমি কিছুতেই ওর সঙ্গে নিজেকে রিলেট করতে পারছি না। আমার থেকে কম বেশি দুমিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে রবি। অথচ আমি অনুভব করছি আমাদের মাঝখানে যেন হাজার যোজন ফারাক। সেই দূরত্ব অতিক্রম করে রবির কাছে পৌঁছোনো যেন কিছুতেই সম্ভব নয়। বর্ষণমুখর তামস রাত্রির মতোই রহস্যময়, অনাকাঙ্ক্ষিত একটা উপলব্ধি যেন অনন্তশাখা বিস্তার করে গ্রাস করতে উদ্যত হল আমাকে।

আমি দেখলাম দুহাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরার জন্য এগিয়ে আসছে রবি। আমি পিছিয়ে যাচ্ছি এক পা, দু-পা করে। রবির মুখের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। বিস্ময়, ক্ষোভ, হতাশা, দুঃখ একাকার হয়ে যাচ্ছে ওর বিবর্ণ মুখের রেখায় রেখায়। বলে উঠল, 'তুই এমন করছিস কেন রঞ্জু? আমি এতক্ষণ মজা করছিলাম তোর সঙ্গে। বিশ্বাস কর। আমার জ্বর অনেক আগেই সেরে গিয়েছে। তুই ছুঁয়ে দেখ আমাকে। আমি রবি। তোর রবি। একটা আস্ত রক্তমাংসের মানুষ।' রুদ্ধ হয়ে এল রবির কণ্ঠস্বর।

না। আর উপায় নেই। রবি আমার খুব কাছে এসে গিয়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে ছুঁয়ে ফেলবে আমাকে। রিফ্লেক্স অ্যাক্শনে যেন ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। তারপর খোলা দরজা পথে দ্রুত ছুটতে লাগলাম বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে।

পেছন থেকে ভেসে আসছে রবির অভিমানহত কণ্ঠস্বর, 'রঞ্জু দাঁড়া। প্লিস এমন করিস না। ফিরে আয়।...রঞ্জু...প্লিজ...রঞ্জু...উ...উ...উ...'

আমি দৌড়োচ্ছি। দৌড়োচ্ছি। দৌড়োচ্ছি। প্রাণপণে ছুটে চলেছি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। রবির ভেসে আসা ব্যাকুল কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল একসময়। আমি তবুও থামলাম না। ছুটতে লাগলাম। পালাতে লাগলাম দূরে, বহুদূরে।

না পালিয়ে উপায় কী আমার? এতদিনের অদর্শনের পর আমর পাগল বন্ধুটা যে আমাকে স্পর্শ করার জন্য, আমাকে ওর বুকে জড়িয়ে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু কী করে ধরা দেব আমি? আমার এই অবয়ব যে প্রতিভাস মাত্র। রক্তে, মাংসে মাখামাখি হয়ে আমার তালগোল পাকানো নশ্বর শরীরটা যে সত্যিই পড়ে আছে সেই খাদের কিনারে।

ভয়ঙ্কর সেই দুর্ঘটনার পরে তিন মাত্রার পৃথিবী ছাড়িয়ে আমি যে চলে এসেছি এক ইন্দ্রিয়াতীত আবর্তে। আমার অশরীরী স্পর্শে আমার প্রিয় বন্ধুর যদি কোনো অকল্যাণ হয়!

আগামী সংখ্যার আভাস

কিশোর ভারতী

রঙিন প্রচ্ছদকাহিনি

ইতিহাসে গুপ্তহত্যা

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

অভিনব গল্পের সিরিয়াল

কিছু মেঘ, কিছু কুয়াশা

লিখছেন নতুন আরেকজন!

পাঁচটি গল্প লিখছেন

শিশির বিশ্বাস

কুণাল সেনগুপ্ত

অপর্ণা মুখোপাধ্যায়

আরও ২ জন

নরম কৈশোরের ধারাবাহিক

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

রুকু সুকু

ধারাবাহিক

দীপান্বিতা রায়

মিকিমোটো নেকলেস

রঙিন কমিকস

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

জগুমামার.

অ্যাডভেঞ্চর

সোনার সাগর রহস্য

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

বগলা অ্যান্ড কোং

জুরান নাথ

শেয়ালের কথা

চণ্ডী লাহিড়ী

বৈজ্ঞানিক ভ্যাবাচ্যাকা

শিবরাম চক্রবর্তী

খেলা ও নিয়মিত আসর

পনেরো টাকা

রহস্য গল্প প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প

সপ্তর্ষি চ্যাটার্জী

উলটো সময়

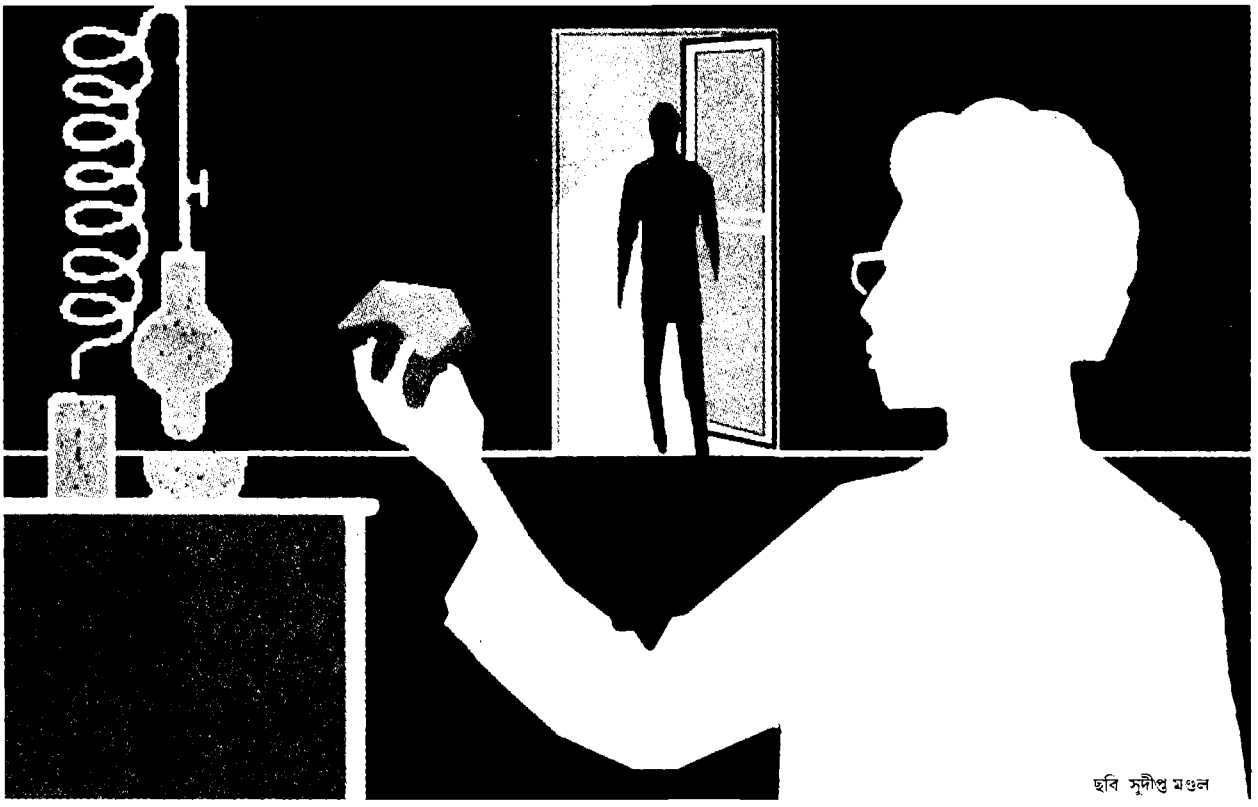

ছবি সুদীপ্ত মণ্ডল

হরিপদ রোজ সকাল হলেই বেরিয়ে পড়ে তার লজঝড়ে মান্ধাতা আমলের সাইকেলটা নিয়ে, চর্মরোগবিনাশী মলম আর বাতের ব্যথার মলম ফিরি করতে। বেতের বাস্কেটে আটকানো বেঢপ চোঙা থেকে অবিরাম বেরোতে থাকে তার খ্যানখেনে কণ্ঠস্বর। একহাতে মাইক ধরে, অন্যহাতে হ্যান্ডেল, পিছনে ক্যারিয়ারের সঙ্গে বাঁধা দুটো ঝুড়িতে বোঝাই করা মলম সাম্রাজ্য।

সোনাডাঙা গ্রামের শেষ প্রান্তে যেখানে বেখেয়ালি বাঁশঝাড় জড়ো করে রেখেছে রাজ্যের অন্ধকার, ইটপাতা সরু ফালি রাস্তাটা হঠাৎ করে থমকে গেছে, সেখানে একটা টিনের চালাঘরে হরিপদর আস্তানা কাম ল্যাবরেটরি।

পড়াশোনার পাট চুকেছিল সেই কোনকালেই, অকালে বাবা-মা দুজনেই গত হওয়ার পর তার দূরসম্পর্কের এক মামা তাকে এই মলম তৈরির কাজ শিখিয়েছিল শহরের একটা কারখানায় নিয়ে গিয়ে। সেখানে ওই মামাও কাজ করতেন। তারপর আস্তে আস্তে আগ্রহের আতিশয্যে পুরো প্রক্রিয়াটা রপ্ত করে ফেলে হরিপদ। আরও উৎসাহী হয়ে একদিন নিজেই বাড়ি ফিরে এসে গবেষণাগার বানিয়ে সেখানে তৈরি করে বেচতে শুরু করে ওই মলম। যৎসামান্য যা জমানো টাকা ছিল তাই সম্বল করে শুরু হয় তার স্বাধীন পথচলা।

কিন্তু অনেকেই জানত না এহেন হরিপদর একটা গোপন শখ ছিল। সেটা হচ্ছে—এটা-সেটা কেমিক্যাল কিনে তাদের নানারকম ভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে নানা পরীক্ষা করা, খাতায় তাদের ফলাফল টুকে রাখা আর নতুন কিছু আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখা।

বলতে গেলে এই শখের কারণেই তার সঞ্চয় কোনওদিনই কিছু হয়নি, উলটে চাল বাড়ন্ত হয়েছে ঘরে। এইজন্য তার বিয়েটাও করা হয়ে ওঠেনি।

বলাই বাহুল্য, এসব পরীক্ষার বেশির ভাগই অসফল হয় কিন্তু পুনরায় নয়া

উদ্যোগে কাজ শুরু করে হরিপদ। আজকাল তার গবেষণার উদ্দেশ্য এমন একটা মলম আবিষ্কার করা যা মাইগ্রেন, সাইনাসের মতো সারতে না চাওয়া যাবতীয় মাথাব্যথা নিমেষে দূর করে দিতে পারবে। সারাদিন সাইকেলে টোটো করে রোদেজলে ঘুরে বিক্রিবাটা করার পরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আবার ওই সব বিদ্‌ঘুটে গন্ধের শিশির বোতল নিয়ে বসতে তার উৎসাহ কীভাবে আসে, সেটা ভেবে অনেকেই অবাক হয়।

তবে হরিপদ শুধু একজনকে ভারী ভক্তি-শ্রদ্ধা করত, মতামত পরামর্শ নিত যখন-তখন।,তিনি গ্রামের স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক অলোকবাবু। তিনিও ওকে স্নেহ করতেন যথেষ্ট, বুঝতেন তার যতটা না উৎসাহ উদ্দীপনা, সে তুলনায় বুদ্ধি বা কর্মক্ষমতা বিশেষ নেই। তবুও ওর সারল্য আর আন্তরিক প্রচেষ্টার তারিফ করতেন আর খুঁটিনাটি উপদেশও দিতেন যথাসাধ্য।

সময় চলে যায় নিস্তরঙ্গ গতিতে আপন খেয়ালে। শান্তশিষ্ট সোনাডাঙা গ্রামের মানুষদের জীবনে তেমন উত্তেজক কোনও ঢেউ আসেনা, কিন্তু ঝড় যখন আসে তখন কি আর বলে-কয়ে আসে।

সেদিন ছিল দুর্যোগের রাত। বৃষ্টি পড়ছিল অল্পস্বল্প, কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ার দাপট বাড়ছিল। এদিকে ঝুলকালি পড়া লণ্ঠনের আলোয় একনিষ্ঠভাবে হরিপদ একটা চিনেমাটির খলের মধ্যে বেশ কয়েকটা রাসায়নিক একটু জল দিয়ে মিশিয়ে নুড়িটা দিয়ে ঘষছিল। কোনওদিকে তার হুঁশ নেই। হঠাৎ তীব্র একটা আলোর ঝলকানি আর কান ফাটানো শব্দ।

বোঝা গেলনা কারণটা ঠিক কী, কাছে কোথাও বজ্রপাত হল না কি হরিপদর মিশ্রণের উপাদান থেকেই বিস্ফোরণ ঘটল, না কি দুটোই এক সঙ্গে। তবে সেটা ভাবার আগে আমরা দেখি হরিপদর কোনও ক্ষতি হল কি না এতে। না, পাঠকের চিন্তার কারণ নেই, হরিপদ বেঁচে আছে, তবে তাকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল তার আধপোড়া ভগ্নস্তূপ গবেষণাগারের মেঝেতে। বেশিরভাগ জিনিসই নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই খল নুড়িটা দিব্যি অক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে পাশে। শুধু তাই নয়, স্বচ্ছ দেখতে একটা পাথরের টুকরো পড়ে আছে ওর মধ্যে।

এভাবেই সকাল হল। দুর্যোগের রাত কেটে স্বস্তির রোদ উঁকি মারল পূর্ব দিগন্তে, হরিপদ দুর্বলভাবে আস্তে আস্তে চোখ মেলল। কাল রাতের ঘটনা বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল তার, আর এক ঝটকায় উঠে বসল সে। প্রথমে সব দেখে খানিকক্ষণ হাঁ করে থাকল বাক্‌রুদ্ধ হয়ে, মাথাটা ঘুরে উঠল আর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল গভীর বেদনায়। ঠিক তখনি তার নজরে পড়ল অদূরে পড়ে থাকা খল নুড়ির মধ্যে ওই স্ফটিকস্বচ্ছ প্রস্তরখণ্ড। চারপাশে তখনও পোড়া গন্ধ, ছাইয়ের আবরণ। ঘরের টিনের চালটা দুমড়ে উড়ে গিয়ে পড়েছে অনেকটা দূরে।

তবু কী একটা অমোঘ আকর্ষণে সব কিছু মুহূর্তের জন্য দূরে সরিয়ে রেখে হরিপদ ওই স্বচ্ছ টুকরোটাকে হাতে তুলে নিল আর যা আছে কপালে ভেবে ওটা কপালে ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে একবার ঘষে দিল আনমনে। কিন্তু এটা কী করল? এমনটা তো করে না কখনো। তাহলে কি ওই স্ফটিকই তার দ্রব্যগুণে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করল তাকে! সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা হিমশীতল বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল তার শরীরে। মাথাটা ঘুরে উঠল প্রবলভাবে আর চোখের সামনে সারা পৃথিবীটা দুলে উঠেই অন্ধকার হয়ে গেল মুহূর্তে। পুনরায় সংজ্ঞা হারানোর পূর্বমুহূর্তে হরিপদর মনে হল তার দেহটা পালকের মতো হালকা হয়ে ভাসতে ভাসতে যেন মেঘের দিকে ছুটে চলেছে আলোর বেগে।

একসময় যেন আছড়ে পড়ল কোথাও। একটা মৃদু ঝাঁকুনির সঙ্গে তার চোখ খুলে গেল আপনা থেকেই।

চোখ কচলে চারদিকে তাকাতেই ভীষণ অবাক হয়ে গেল হরিপদ। দেখল প্রশস্ত রাজপথ, পাথরে বাঁধানো। দূর থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি ছুটে আসছে। তার আরোহীর গায়ে অদ্ভুতদর্শন জরির কাজকরা পোশাক, হাতে বল্লম, শিরস্ত্রাণ; যেমনটা ঐতিহাসিক যাত্রাপালায় দেখেছে সে সোনাডাঙার মাঠে।

হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দে চমকে পিছনে ফিরে দেখতে পেল একঝাঁক কমবয়েসি মেয়ের দল কলসি কাঁখে জল নিয়ে ফিরছে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদও ভারী অদ্ভুত, মাথায় হাতে পায়ে ফুল দেওয়া, সোনার গয়না পরা। এমনভাবে চলেছে যেন ছিনতাইয়ের কোনও ভয় নেই।

ব্যাপারটা বোধগম্য হওয়ার আগেই কানে আসে দামামার শব্দ। ঘোড়ার গাড়ি চড়ে কয়েকজন শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে আর দামামা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে। বেশ লোক জড়ো হয়ে গেল চারপাশে। তারপর বাজনা থামিয়ে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল,—'প্রিয় প্রজাগণকে ভারতের অধীশ্বর সম্রাট অশোকের বার্তা ঃ সম্রাট দেশসফরে বেরিয়েছেন, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ প্রচার করতে। শীঘ্রই তিনি এ রাজ্যেও পৌঁছে যাবেন। আপনারা সকলে শান্তি সদ্ভাব বজায় রাখুন। বুদ্ধং শরণম গচ্ছামি।'

হরিপদ এবার সত্যি ভয় পেয়ে যায়। বসে পড়ে পথের মধ্যেই মাথাটা চেপে ধরে। সেই ছোটবেলায় পড়া পুরো ইতিহাসবইটা যেন চোখের সামনে জ্যান্ত দেখতে পাচ্ছে সে, অথচ তাকে যে কেউ খেয়াল করছে না, সেটাও বেশ বুঝতে পারছে। তালগোল পাকানো মগজটাকে শান্ত করতে অজান্তেই হাতটা ঘষে কপালে ঠেকাল আর তখনি ভোজবাজি ফের। কোথায় গেল লোকলশকর, ঘোড়ার গাড়ি, প্রাচীন পথঘাট? দেখল সে বসে আছে নিজের ভাঙাচোরা ল্যাবরেটরিতেই। হাতে ধরা সেই আশ্চর্য বস্তু। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে সে ব্যাপারটা কিছুটা আন্দাজ করে। এ সবই তাহলে ওই পাথরের কেরামতি। কিন্তু কীভাবে? মাথায় ঢোকে না তার। যিনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন তাঁর কথা মনে পড়ল হরিপদর। অলোকবাবু। পাথরের টুকরোটা নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল ওনার বাড়ি। সবকিছু একনিশ্বাসে বলে হাঁপাতে হাঁপাতে ধপাস করে মেঝেতে বসে পড়ল সে।

অলোকবাবু প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু যখন কাঁপা কাঁপা হাতে হরিপদর বাড়িয়ে দেওয়া পাথরটা দেখলেন, তখন সত্যি অবাক হলেন, আর কৌতূহলও বড়ল প্রচণ্ড। নেড়েচেড়ে দেখে তিনি পরিচিত কোনও বস্তুর সঙ্গে মিল পেলেন না জিনিসটার। হরিপদকে নিজের ইচ্ছের কথা বলতে সে তো এককথায় রাজি। অসহায় দৃষ্টিতে সে ওটা সমর্পণ করল অলোকবাবুর হাতে।

কয়েকদিন এটাকে নিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে বুঝলি? নইলে ঠিক বুঝতে পারব না ব্যাপারটা।

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে যায় হরিপদ। আর অলোকবাবু মগ্ন হন পাথরটাকে নিয়ে। টানা তিন দিন তিন রাত সম্ভাব্য সবরকম শনাক্তকরণ পরীক্ষা চালিয়েও পরিচিত কোনও পদার্থের সঙ্গে জিনিসটার বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ গঠন ও প্রকৃতির কিছুমাত্র সাদৃশ্য খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলেন তিনি। তবে কয়েকটা তথ্য পাওয়া গেল যেগুলো শুধু যে চমকপ্রদ তা-ই নয়, রীতিমতো যুগান্তকারী বলা চলে। সাধারণ কয়েকটা রাসায়নিক হঠাৎ প্রচণ্ড তাপ আর তড়িৎপ্রবাহের ফলে বিশেষ একটা কেলাসে রূপান্তরিত হয়েছে যার বর্ণ কিছুটা স্বচ্ছ। হয়তো ওই বিরাট পরিমাণ তাপ-তড়িতের উৎপত্তি সে রাতের বজ্রপাতই। কিন্তু ওই কেলাসের আসল রহস্যটা অন্য।

অলোকবাবু দেখলেন, এই কেলাস-গঠনকারী অণুগুলোর মধ্যে একটা কম্পন সৃষ্টি হচ্ছে যে-কোনও প্রাণীশরীরকে কাছাকাছি আনলেই। আর তখনি হরিপদর ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া কাণ্ডটার একটা সূত্র পেলেন তিনি। বুদ্ধিমান অলোক মিত্র বুঝলেন মাথার সঙ্গে ওই কেলাসের স্পর্শে ও ঘর্ষণে যে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে তা ক্ষণিকের মধ্যে ওর অণুগুলোকে প্রবলভাবে কম্পিত করে একটা বিশেষ তরঙ্গের সৃষ্টি করছে। যে তরঙ্গ মানব মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে অনবরত কাজ করতে থাকা সূক্ষ্ম চিন্তাতরঙ্গের সঙ্গে জোট বেঁধে অনুনাদ ঘটাচ্ছে। যার ফলে মস্তিষ্ক এক বিশেষ আচ্ছন্নতার মধ্যে প্রবেশ করছে।

ওই অনুনাদী তরঙ্গের বেগ গণনা করে দেখা গেল আলোর থেকেও বেশি, সেকারণে একটা ভার্চুয়াল টাইম মেশিনের মতো কাজ করছে ওই আশ্চর্য পাথর। মানুষের শরীরকে অচেতন অবস্থায় বর্তমানেই ফেলে রেখে মানুষের আত্মা বা অন্তর স্বত্তাকে নিয়ে যাচ্ছে সুদূর অতীতে। আবার কপালে হাত ঘষলে সেই প্রভাব প্রশমিত হয়ে বর্তমানে ফিরিয়ে আনছে তাকে। কথায় বলে 'নাদ ব্রহ্ম'।

বিজ্ঞানীদের মতে এবং পুরাণ মতেও জগতের সৃষ্টি একটা আমোঘ শব্দের থেকেই। আর শব্দ মানেই কম্পন। এও সেই কম্পনেরই এক মায়াবী খেলা। সময়ের সীমা-পরিসীমা মুছে যাচ্ছে এর এক ছোঁয়ায়। কালের গর্ভে তলিয়ে থাকা সময় জীবন্ত হয়ে উঠছে পলকে। অজান্তে এবং দুর্ঘটনাজনিত এই আবিষ্কারের তাৎপর্যের কথা ভেবে রোমাঞ্চিত হন অলোক মিত্র। তবে মুশকিল

একটাই। যে সব রাসায়নিকের ওপর তিনি তাপ ও তড়িৎপ্রবাহ প্রয়োগ করেছিলেন, তার পরিমাণ এবং প্রয়োগমাত্রা লিখে রাখেননি, তাই কম্পনকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

অলোকবাবুর মাথায় হঠাৎ একটা কাঁটা খচখচিয়ে উঠল। আচ্ছা এই আবিষ্কার যদি লোকসমাজের সামনে আনা যায় তখন সিংহভাগ কৃতিত্ব আর সুনামই তো জুটবে ওই হতভাগ্য অশিক্ষিত হরিপদর নামে। যে এর বিন্দুবিসর্গও বুঝবে না। আর তিনি যে কষ্ট করে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসল কারণটা বের করলেন, তাঁর সাফল্যের ফল ভোগ করবে ওই ব্যাটা! তখনি একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। আচ্ছা তিনি ছাড়া আর তো কেউ এখনো জানেই না ব্যাপারটা সম্পর্কে। আর সে সম্ভাবনাও কম যেহেতু হরিপদর একমাত্র ভরসার স্থল তিনি।

আচ্ছা হরিপদকে যদি তারই ওষুধে কাবু করে রাখা যায় তবে কেমন হয়? যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। হরিপদর চালাঘরে উপস্থিত হলেন অলোকবাবু। এটা সেটা বলতে বলতে হঠাৎই জোর করে হরিপদর কপালে ঘষে দেন তার সেই পাথর, আর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় তার হাতদুটো বেঁধে ফেললেন। যাতে চট করে কপালে হাত রেখে ফিরতে না পারে এসময়ে।

হরিপদর অচেতন দেহটা এলিয়ে পড়ে মেঝেয়। সেটাকে টানতে টানতে ওর নিজের ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা আটকে পাথরটা নিয়ে বাড়ি ফেরেন অলোকবাবু নিশ্চিন্তমনে। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয় তাঁর কপালে, শুকিয়ে আসা জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁটটা আনমনে ভিজিয়ে নিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালটা মুছে ফেলেন তিনি।

এরপর সামান্য খাটাখাটনি করে মিস্টার মিত্র বানিয়ে ফেললেন একটা বিশেষ হেলমেট যেটাতে ফিট করা হল আশ্চর্য ক্রিস্টাল 'মিত্রিয়াম'-এর এক এবং অনন্য টুকরোটি। হেলমেটের সঙ্গে লাগানো নিয়ন্ত্রণ নবের সাহায্যে একজন ইচ্ছেমতো সময়ে ঘুরে আসতে পারেন। সময় সেট করার জন্য শুধু একটা বোতামে চাপ দিতে হবে যেটা আছে হেলমেটের কপালের ঠিক মাঝখানে, যেটা মিত্রিয়ামকে স্পর্শ করাবে কপালে, সত্যি করবে স্বপ্ন।

পরীক্ষা করার জন্য তিনি হেলমেটটা পরে নিলেন মাথায়। নব সামান্য একটু ঘুরিয়ে কপালে ক্রিস্টালটা ঠেকিয়ে চলে গেলেন বিংশ শতকের প্রথম ভাগে। দেখলেন একটা বড়সড় মাঠ। কাতারে কাতারে লোক জড়ো হচ্ছে। সাজো সাজো রব চারদিকে। হঠাৎ তুমুল করতালির শব্দ। দেখা গেল জমিদার স্থানীয় কোনও ব্যক্তি এক গোছা ফুলের মালা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন মঞ্চে উপবিষ্ট এক প্রৌঢ়ের দিকে। কালো জোব্বা পরা সেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াতেই আরেক প্রস্থ তুমুল হর্ষধ্বনি। সাদা বাবরি চুল, মাথায় কালো অদ্ভুত টুপি আর একরাশ অবিন্যস্ত কাঁচাপাকা দাড়িবিশিষ্ট ওই মানুষটাকে দেখেই অলোকবাবুর মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় স্কুলে পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানের ছবিটা। রবীন্দ্রনাথ! আহ্!

কবিগুরু এরপর মাইক্রোফোনের সামনে এসে ভরাট গলায় আবৃত্তি করে উঠলেন 'দে দোল দোল...'। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল অলোকবাবুর। তড়িঘড়ি কপালে হাত ছুঁইয়ে আবার ফিরে এলেন নিজের ঘরে।

সে মাসেই বিদেশের এক প্রখ্যাত সায়েন্টিফিক জার্নালে প্রকাশিত হল বাঙালি বিজ্ঞানী অলোক মিত্রের এই আবিষ্কারের কথা। সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠলেন তিনি। খবরের কাগজের প্রথম পাতায়, টিভি চ্যানেলের জনপ্রিয় টক শো-তে সব জায়গায় দেখা যেতে থাকল মিত্রিয়ামের পেটেন্ট নেওয়া অলোকবাবুকে। বাণিজ্যিকভাবেও এই হেলমেট বাজারে আনার জন্য বিভিন্ন সংস্থা প্রচুর টাকার চুক্তি করতে চাইল তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তিনি কিছুটা সময় চেয়ে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন সযত্নে।

আসলে সবকিছু হলেও এখনো তো অলোকবাবুর কাছে অধরা এই ক্রিস্টালের প্রস্তুতি রহস্য। ওটা না জানলে এই মহামূল্যবান জিনিসটার কোনও প্রতিরূপ গড়ে তোলা যাবে না। অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম এখনো মিত্রিয়াম। তাই কিছুটা সময় সকলের কাছে চেয়ে নিয়ে অলোকবাবু আবার ফিরে গেলেন নিজের বাড়ির গবেষণাগারে।

নিবিষ্টচিত্তে কাজ করে চলেছেন এমনই এক ঝড় জলের রাতে। লোডশেডিং হল হঠাৎ। মোমবাতিটা জ্বালাতে যাবেন ঠিক তখনি ছাদের দিকের দরজায় একটা খুট করে শব্দ শোনা গেল। মুখ তুলে ছাদের দরজাটার দিকে তাকালেন অলোকবাবু আর তাকিয়ে অস্ফুটে একটা আওয়াজ করে ফেললেন। ঝড়-জলের প্রেক্ষাপটে অন্ধকার ছায়ামূর্তির মতো দরজা ধরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ওটা কে? 'কে-কে ওখানে?' চেঁচিয়ে ওঠেন মিত্রমশাই।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঝলসে ওঠে বিজলী, আর উদ্ভাসিত আলোয় পলকের জন্য দেখা যায় রহস্যময় আগন্তুকের অবয়ব। হরিপদ। এখানে এত রাতে! তার চেয়েও বড় কথা সে এল কী করে। তাকে তো সেই কবে হাত বেঁধে ফেলে এসেছেন স্বয়ং অলকবাবু মিত্রিয়ামের আরোপিত নিদ্রায়। চেতনা ফিরবে কীভাবে কপালে আবার হাত না ঘষলে? অনেক কিছু মেলাতে পারেন না বিজ্ঞানী। সব গোলমাল হয়ে যেতে থাকে তাঁর। তবু মনে মনে অনেকটা শক্তি সঞ্চয় করে জড়ানো গলায় বলে ওঠেন, 'তু-তুই এখানে কীভাবে এলি? মানে আমি তো...'

হা হা করে আকাশ কাঁপিয়ে হেসে ওঠে হরিপদ। বাজ পড়ার আওয়াজ ছাপিয়েও সে শব্দ যেন ধ্বনিত হতে থাকে অলোক মিত্রর মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে দামামার মতো। ঘোর লাগা অবস্থায় তিনি শুনতে পান অনেকটা দৈববাণীর মতো জলদগম্ভীর কণ্ঠে হরিপদ বলে চলেছে কেটে কেটে...

'স্যার আপনি তো আমার হাত বেঁধে রেখেছিলেন যাতে আবার কপালে হাত ছুঁইয়ে ফিরতে না পারি এই সময়ে —তাই না? কিন্তু আপনার হয়তো খেয়াল ছিল না আমর পা দুটো খোলাই ছিল। আপনি আমার কপালে ওই পাথরটা ঠেকাতেই আমি এবার গিয়ে পৌঁছোই আরও প্রাচীনকালে বৈদিক যুগের ভারতে। জনবসতি খুবই কম সে সময়ে। চারদিকে ঘন জঙ্গল। তার পাশে ছোট ছোট জনপদ। হাত বাঁধা থাকায় খুব কষ্ট হচ্ছিল।

'যাই হোক, পা-টা খোলা থাকায় হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পৌঁছোই এক মুনিঋষির আশ্রমে। তিনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন। দুচোখ বোজা। সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, আর ও মা, দেখি তিনি কথা বলে উঠলেন আমায় দেখে, 'হে আগন্তুক তোমার সমস্যার কী সমাধান করতে চাও?' অথচ তাঁর ঠোঁট নড়ছিল না এতটুকু। বুঝলাম তাঁর যোগবলের শক্তি ধরে ফেলেছে আমার সূক্ষ্ম দেহের উপস্থিতি, পড়ে ফেলেছে আমার চিন্তাতরঙ্গের গতিবিধি।

যাই হোক, আমিও সব খুলে বললাম। আপনাকে যা যা বলেছিলাম সবটাই। একবার মনেও হল যে আগে কেন এই মানুষটার সঙ্গে দেখা হল না আমার। তাহলে তো আর আপনাকে বিশ্বাস করে ঠকতে হত না বলুন? হা হা! যাই হোক, যোগীবাবা যা বললেন তা হল আমি যদি কোনও ভাবে নিজের সূক্ষ্ম সত্তাটিকে ওনার পবিত্র হোমানলে আহুতি দিতে পারি তাহলে এই দশার মুক্তি ঘটবে। অর্থাৎ আমার আত্মা মুক্ত হয়ে যাবে দেশ কালের সীমানা থেকে। তারপর আমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারব। হয়তো নিজের পুরোনো দেহটায় আর ফিরে যেতে পারব না, কিন্তু এটাই বা কম কী বলুন? তাঁর কথামতো কাজ করলাম। চোখ বন্ধ করে একটা মোক্ষম ঝাঁপ দিলাম জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে।।

মুক্তি পেলাম। আর পেয়েই ছুটে এসেছি আপনার কাছে। জানেনই তো আমি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে তেমন পছন্দ করতাম না। কার কাছেই বা যাব বলুন?

তবে একটা কথা, আমি তো এখন মুক্ত। কিন্তু আপনি দেখুন ওই এক হতচ্ছাড়া পাথরের চক্করে পড়ে কেমন রাতের ঘুমটুম সব জলাঞ্জলি দিয়েছেন। আপনার দশা দেখেও আমার কষ্ট হচ্ছে খুব। তাই ঠিক করলাম আপনাকেও একটু মুক্তির স্বাদ দিই কেমন? দেখুন ওই জিনিসটা বড্ড সর্বনেশে, ভেবে দেখলাম আমার মাথায় এসব পরীক্ষা-টরীক্ষার ভূত না চাপলে দিব্যি মলম বেচে টেনেটুনে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত। সাধে কি আর বলে "খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে।" কী যে দুর্বুদ্ধি চেপেছিল ছাই। আসুন এদিকে...'

বলতে বলতে এক পা এক পা করে দু-হাত প্রসারিত করে এগোতে থাকে হরিপদ, নাকি তার মুক্ত আত্মা। অলোকবাবু বুঝতে পারেন ভয়ে পিছোতে পিছোতে তিনি প্রায় নীচু পাঁচিল দেওয়া ছাদের কোনার দিকে চলে এসেছেন আর তাঁর মৃত্যুদূত মাত্র কয়েক ফুটের ব্যবধানে। এগিয়ে আসছে আরও— আরও। চিৎকার করে ওঠেন সভয়ে—'না না হরিপদ, আমায় মেরো না প্লিজ। আমি ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা। দোহাই আমায় ক্ষমা করে দাও ভাই। আমি চাইনি ওটা করতে। আমি বলব সবাইকে দেখো, যে ওটা তোমারই আবিষ্কার, আমার নয়। আমি তো শুধু...না-না আর এগিও না...'

রহস্য গল্প প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প

অভীক মুখোপাধ্যায়

আতঙ্ক যখন বহুমুখী

ছবি সঞ্জীব পাল

যাঁরা বাংলা গল্প-উপন্যাসের নিয়মিত পাঠক, বিশেষ করে রহস্য-রোমাঞ্চ-কল্পবিজ্ঞানের, তাঁদের কাছে ত্বিষাম্পতি বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট পরিচিত।

দীর্ঘদেহী এই লেখক শেষ জীবনে বয়সকালীন অসুস্থতার জন্য নিজের হাতে আর লিখতে পারতেন না। আমি তাঁর গল্প-উপন্যাসের অনুলিখন করতাম।

মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর কয়েকটা ডায়েরি আমার হাতে তুলে দিয়ে যান। বলেছিলেন যে ওই সব ডায়েরিতে তাঁর জীবনের কিছু অত্যাশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ আছে, যেগুলো তাঁর পক্ষে কাহিনির আকারে লিখে যাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমি যেন তাঁর মৃত্যুর পরে এগুলি কাহিনি আকারে প্রকাশ করি।

আজ সেরকমই এক রোমহর্ষক গল্পের, থুড়ি, সত্যের সামনাসামনি আনব আপনাদের। ত্বিষাম্পতিবাবুর ডায়েরির পাতা থেকে সরাসরি আনছি বিষয়বস্তু।

১৭ এপ্রিল, ১৯৮১

সকাল সকাল বিখ্যাত অরনিথোলজিস্ট সালিম আলির লেখা 'The Book Of Indian Birds' নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময়ে পোস্টম্যান এসে চিঠি দিয়ে গেল। চিঠির প্রেরক দাশরথি—আমার প্রিয় ভাগ্নে, যে সদ্য যোগ দিয়েছে ইন্ডিয়ান 'ফরেস্ট সার্ভিস'-এর মধ্যপ্রদেশ ক্যাডারে। চিঠির বয়ান অবিকল তুলে দিলাম।

শ্রদ্ধেয় মামাবাবু,

আপনার খবর আশা করি ভালোই। আমারও নতুন জায়গায় নতুন ধরনের জীবন বেশ লাগছে। নিত্য নতুন অ্যাডভেঞ্চার। আপনার নতুন কিশোর উপন্যাস 'কালের কপোল' পড়ে ফেলেছি এই সুদূর মধ্যপ্রদেশে বসেই।

এখন আমার পোস্টিং হয়েছে মধ্যপ্রদেশের কাঙ্গেরঘাটিতে। এখানে ন্যাশনাল পার্ক তৈরি হচ্ছে সে খবর হয়তো আপনি আগেই জেনে গেছেন। কাঙ্গেরঘাটি

ন্যাশনাল পার্ক। ডেপুটি ফরেস্ট অফিসারের বাংলো তৈরি হয়ে গেছে, আর কয়েক মাসের মধ্যেই সাধারণ মানুষের জন্য পার্কের দরজা খুলে দেওয়া হবে। আমার ইচ্ছা আপনি এখানে একবার ঘুরে যান।

তবে যে কারণে আপনাকে এই চিঠি লিখছি তা শুনতে একটু অদ্ভুত লাগবে। পার্কের বেশিরভাগ অংশই এখন অবধি সরকারের লোকজনের চোখের আড়ালেই থেকে গেছে ঘন অরণ্যের কারণে। আমার দায়িত্ব থাকায় আমাকে 'কোর এরিয়া মার্কিং' করতে মাঝে মাঝেই বেরোতে হয়। এই কাজে বেরিয়েই একদিন আমার চোখ পড়ে যায় পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের পাহাড়ি উপত্যকার কাছে একটি গুহামুখের ওপর। গুহামুখের বাইরের পাথুরে দেওয়ালে অদ্ভুত খোদিত মূর্তি লক্ষ করি। মূর্তিটি একটি বহুমস্তক সর্পের। এদিকের অরণ্যের গভীরে মাড়িয়া, গোন্দ, মুড়িয়া উপজাতির কিছু মানুষ আছে, হয়তো তাদেরই কাজ এসব!

জুলজির ছাত্র হওয়ার সুবাদে আমার জানা আছে যে বহুমস্তক সম্পন্ন প্রাণীকে Polycephaly বলে। কিন্তু আমার জ্ঞান বুদ্ধি বলে এমন বহুমস্তক যুক্ত সর্প থাকতে পারে না, কারণ দৈহিক গঠন তেমন হলে সাপ মাথাগুলি নিয়ে উঠে দাঁড়তেই পারবে না আর তার পক্ষে বেঁচে থাকা দুষ্কর হবে। তবে আপনি অনেক পড়াশোনা করেন, বিশদে জানবেন হয়তো এইসব সম্পর্কে! তাই বলছি, চলে আসুন। কিছু পান বা না পান ঘুরে তো যাওয়া হবে।

চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবেন, আসার ব্যাপারে, আমি ব্যবস্থা রাখব। ভালো থাকবেন। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি

দাশরথি

২১ এপ্রিল, ১৯৮১

আজ সকালে যখন রিডিং রুমে বসে ভাগ্নেকে চিঠিতে কী লিখব ভাবছি, তখনই হইহই করে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এসে উপস্থিত হলেন আমার প্রতিবেশী বন্ধু অমরেন্দ্র বটব্যাল মহাশয়।

ভদ্রলোকের কাছে আমার বাড়ি একেবারে অবারিত দ্বার।

—কী মশায়! নতুন গপ্পো ফাঁদছেন বুঝি?

—বলতে পারেন ভিত খুঁড়ছি।

—দেখুন দ্বিষাম্পতিবাবু, আপনি যেমন সহজ করে গপ্পো বানিয়ে লেখেন, তেমন করে যদি বাস্তবেও কথা বলতেন—

—আমি জটিল করে কই বুঝি?

—সবাই তো তাই বলে।

বলেই 'হো হো' শব্দে জোর হাসলেন অমরেন্দ্রবাবু।

হঠাৎ আমার নাকে বুনো পাতাচটকানো গন্ধ আসায় আমি নাক সিটকে এধার-ওধার গন্ধের উৎস খুঁজতে লাগলাম। আমার চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ করে অমরেন্দ্রবাবু বললেন,—টের পেয়ে গেছেন দেখছি! তা ভালো। নাক এখনও সতেজ আছে।

অমরেন্দ্রবাবু ফের শুরু করলেন,—মশায় আমার সাধুসঙ্গ করার অভ্যাস। যেই না খবর পেয়েছি কালীতলার কাছে এক সাধু এসেছেন, ব্যস, বাবাজি যায় কোথায় আমাকে দর্শন না দিয়ে! 'বাঘমারা সাধু' তাঁর নাম বুঝলেন কিনা!

—তা তাঁর সঙ্গে এই বুনো গন্ধের কী সংযোগ?

—আছে মশায় আছে। এ হল গিয়ে 'অহিপর্ণী' বুটিকার প্রলেপ। কপালে মেখেছি। মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল, তো সাধুবাবাকে বলতেই উনি বের করে দিলেন ওনার ঝোলার থেকে। বললেন বেটে কপালে লাগাতে।

—অমরেন্দ্রবাবু এই উগ্র ভেষজ গন্ধে আপনার যন্ত্রণা দূর হবে কিনা জানি না, তবে আশেপাশে জীবিত সব প্রাণী যা থাকবে তারা দূরে কেটে পড়বে সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন।

একথা-সেকথা হতে হতে আমিই ওনাকে দাশরথির চিঠির কথা বললাম। শুনেই অমরেন্দ্রবাবু বললেন,—মশায় আমাকে নিন না! শুনে মনে হচ্ছে একেবারে গহন অরণ্য। নিজেকে জিম করবেট মনে হবে যদি একবার যেতে পারি।

—ওখানে গিয়ে নিজেকে জিম করবেট ভেবে যদি শিকার করে বসেন তাহলে জেলের ঘানি টানতে হবে কিন্তু বাকি জীবনটায়। ওটা ন্যাশনাল পার্কের মর্যাদা পাওয়া বনভূমি হতে চলেছে। সেখানে জীবজন্তুরা মুক্ত বিচরণ করবে নির্ভয়ে।

—ওই হল। আমি কি সত্যিই করবেট সাহেব নাকি? ওটা মনে একটা পুলকিত ভাব জাগায় তাই বলে ফেললাম।

—তাহলে আমরা জুনে রওনা দেব। দেখা যাক কী জোটে আমাদের এই যাত্রায়!

২রা জুন, ১৯৮১

পরশু পৌঁছোতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। রাতে মুরগির ঝোল, রুটি খেয়ে এক ঘুমে সকাল। ভেবেছিলাম কাল ডায়েরি নিয়ে বসব, কিন্তু সত্যি বলতে সারা দিন জঙ্গলের বেশ কিছুটা অংশে ঘোরায় শরীর আর সঙ্গ দিল না। অমরেন্দ্রবাবু অবশ্য খাওয়া আর ঘুমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটা জিনিস বাড়িয়েই চলেছেন, তা হল ওনার 'বাঘমারা সাধু'র দেওয়া সেই 'অহিপর্ণী' বুটিকার ক্বাথ। এখন বাংলোর অন্য ঘরে থাকলেও তাঁর উপস্থিতি তীব্রভাবে টের পাচ্ছি আমরা। অবশ্য তাঁর বক্তব্য মাথার যন্ত্রণা নাকি পালিয়েছে এর ব্যবহারে।

দাশু, মানে আমার ভাগ্নে আতিথেয়তার কোনও ত্রুটি রাখেনি। ফরমাশ খাটার জন্য দুজন স্থানীয় আদিবাসী ছেলে আছে, মংলু আর তিঙ্কা, তারা আমাদের আদেশের জন্য একেবারে একপায়ে খাড়া।

মংলু আর তিঙ্কা দুজনেই হিন্দি বলতে পারে, তাই কথা বলতে অসুবিধা হয়নি।

আমাদের সঙ্গে কাজের জন্য সব সময়ে দাশু থাকতে না পারলেও মংলু আর তিঙ্কা এরা দুজনে থাকছেই। আরও একজন আমাদের পিছু ছাড়ছে না, সে হল মংলুর পোষা কুকুর 'ভালু'। দেশি কুকুর কিন্তু গলায় আর চেহারায় সাহেবিগুলোকেও হার মানায়। আমাদের পায়ে পায়ে সেও ঘুরে চলেছে আর যেখানেই কোনও বন্য প্রাণীর অবস্থান টের পাচ্ছে, 'ঘেউ ঘেউ' শব্দে মাতিয়ে দিচ্ছে একেবারে।

গোটা দিন একদম ঝকঝকে ছিল। সন্ধের পর বাংলোয় বসে লিখতে মন্দ লাগছে না। পেট্রোম্যাক্সের আলো; এখনও এখানে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। দাশু সন্ধেতে একবার আমার কাছে এসে বলে গেল সেই গুহামুখের কথা—যার কথা ও আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিল। সেখানে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দু-একদিনের মধ্যেই যাওয়া হবে।

৪ জুন, ১৯৮১

যে খোদিত মূর্তি গুহামুখের সামনে দাশু দেখতে পেয়েছিল তার প্রসঙ্গে পড়াশোনা করতে গিয়ে আমি জানতে পারি ভারতীয় এবং পাশ্চাত্যের প্রাচীন 'মিথ' এই ধরণের বহুমুখী সর্পের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে।

পড়ার সময় কখনও পেয়েছি 'শেষনাগ'-এর কথা। এর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ভগবান বিষ্ণু এর ওপর বিরাজমান। শেষনাগের মাথা সংখ্যায় কখনও পাঁচ, কখনও সাত আবার কখনও বা তা-ই বেড়ে হাজার বলে দেখানো হয়েছে। নাগরাজ বাসুকি, কালীয় নাগ এদের সবার ক্ষেত্রে একই কথা খাটে। এ ছাড়াও ভারতীয় পুরাণে কার্তিকের ছয় মাথা, ব্রহ্মার চার মাথা, ব্রহ্মার পত্নী গায়ত্রীর পাঁচ মাথা, রামায়ণে রাবণের দশ মাথা কিংবা রাবণনন্দন ত্রিশিরের তিন মাথার উল্লেখ মেলে। দেবরাজ ইন্দ্রের ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবাঃরও সাতটি মাথা ছিল।

আরও আছে, সদাশিবরূপী মহাদেবের ভগবদ গীতায় বিশ্বরূপে প্রকাশিত কৃষ্ণের, হেরম্বরূপী গণেশের বহুমস্তক দেখা যায়। শুধু ভারত না, গ্রিক মিথোলজির বহুমস্তক সর্প হাইড্রা, সর্প এবং ড্রাগনের মিশেল বহুমস্তক সম্পন্ন লাডন, তিন মাথার কুকুর সারবিরুস—সুপ্রাচীন কাল থেকে বহুমস্তক সম্পন্ন প্রাণীর অস্তিত্ব নিয়ে বার বার যুক্তিকে ধাক্কা দিয়ে চলেছে। সর্পকেশী মেডুসা নিয়ে গ্রিক আখ্যান সুবিদিত। ইস্তানবুলে ব্যাসিলিকা সিস্টার্নে মেডুসার তিনটি স্তম্ভমূর্তি সেই সাক্ষ্য বহন করছে।

এ ছাড়াও একদম বাস্তবে আমাদের বাংলাদেশেই ১৭৮৩ সালে একটি ছেলে জন্মায় যার দুটি মাথা দেখা গিয়েছিল, অবশ্য সে সুস্থ ছিল না। ব্রিটিশ ভারতে 'Two Headed Boy Of Bengal' নামে বিখ্যাত সেই বালক ১৭৮৭ সালে সাপের কামড়ে মারা যায়। অর্থাৎ, এই বহুমস্তক প্রকৃতির আপন খেয়ালে আবির্ভূত হতেই পারে।

তবে শুধু এটুকুই না, আমি সন্ধান পেয়েছি এই মধ্যপ্রদেশেরই নগপুরা নামক স্থানে একটি জৈন মন্দির আছে, সেখানে সপ্তফণা বিশিষ্ট নাগমূর্তি জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। অর্থাৎ, এ রাজ্যের নানা জায়গায়ও

বহুমস্তক সর্পের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের খামতি নেই।

কালই আমরা সেই রহস্যময় গুহামুখের উদ্দেশ্যে রওনা দেব। কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে কেমন যেন মনে হচ্ছে সব কিছু ঠিকঠাক হচ্ছে না। অশনি আভাস।

মংলু ডাক দিয়ে গেল খাবার তৈরি হয়ে গেছে, আমিও আঘ্রাণ পাচ্ছি। মেনুতে আছে রুটি, মুরগি, আমড়ার আচার, কাঁচা পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা। তর সইছে না, এখন উঠি।

৫ জুন ১৯৮১

গুহামুখের একদম বাইরে তাঁবু খাটানো হয়েছে, ভোজনপর্ব সেরে তাঁবুর মধ্যে পেট্রোম্যাক্সের আলোয় আমি ডায়েরি লিখছি।

একদম ভোরেই উঠে আমরা পূর্বনির্দিষ্ট গুহামুখের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। আমরা বলতে আমি, অমরেন্দ্রবাবু, দাশু, মংলু, তিঙ্কা, ভালু আর সঙ্গে আটজন স্থানীয় আদিবাসী কুলি, যারা এই জঙ্গলকে হাতের তালুর মতো চেনে। পায়ে হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে কাঙ্গের নদীর পূর্ব পাড় ধরে বেশ কিছুটা যাওয়ার পরে আমরা নদী পেরিয়ে এগোতে শুরু করি। যাত্রাপথের শুরু থেকেই জঙ্গল এত ঘন যে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোনও গতি নেই।

একেবারে অভেদ্য জঙ্গল, 'পেন্সিল লাইট'-এর মতো কিছু কিছু জায়গায় সূর্য কিরণ প্রবেশ করেছে মাত্র। যেন এক চির অন্ধকারময় জগতে প্রবেশ করতে চলেছি আমরা!

আমরা সার বেঁধে চলছিলাম। পথ দেখাচ্ছিল আদিবাসীদের মধ্যে একজন, পরেই মংলু, ভালু আর তিঙ্কা। তার পরেই আমি, আমার পিছনে ছিলেন অমরেন্দ্রবাবু আর সবশেষে দাশু আর বাকি আদিবাসীরা। অমরেন্দ্রবাবুর কপালে সেই 'অহিপর্ণী' বুটিকার প্রলেপ।

বেশ কিছু পথ আসার পর হঠাৎ ভালুর ক্রুদ্ধ 'গরগর' আওয়াজ কানে এল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিছু একটা দেখে ভয়ে ছিটকে এল মংলু। আমি এগোতে যাব এমন সময়ে মংলু ইশারায় থামতে নির্দেশ করল। দেখলাম একটা পাইথন একটা বন্য শূকরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। তিলে তিলে চোখের সামনে নিঃশেষ হয়ে গেল শূকরটা। একটি প্রাণ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আরেকটি প্রাণকে শেষ করে দিল।

মংলু বলল,—ইয়ে জঙ্গলরাজ হ্যায় বাবুজি, জোর জিসকা জঙ্গল উসকা।

বুঝলাম যে মংলু আমাদের সুপরিচিত ডারউইন সাহেবের 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট' থিয়োরির দিশি সংস্করণের কথা বলল।

সূর্য তখন মধ্য গগনে, অন্তত আমার রিস্ট ওয়াচ তাই জানান দিচ্ছে। কিন্তু ঘন জঙ্গলে তা আকাশ দেখে বোঝার উপায় নেই। পথে অমরেন্দ্রবাবুর ক্লান্তি লাগায় আমাদের দুবার বিশ্রাম নিতে হয়েছে, কিন্তু মংলুর তাড়ায় আবার চলা শুরু করতে হয়েছে। ও বারবার বলেছে যে অন্তত সন্ধের আগে না পৌঁছোতে পারলে মুশকিল। অগত্যা অমরেন্দ্রবাবু বিশ্রামপর্বে ইতি টানতে বাধ্য হয়েছেন।

এক জায়গায় হঠাৎ আমাদের যাত্রাপথের সামনের একটি ঝোপে একটু নড়চড় দেখা গেল। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা থমকে গেলাম। ভিতরের রহস্য সামনে আসতে খুব দেরি করল না, চকচকে হলুদ চামড়ার ওপর কালো ছোট ছোট ফুটে থাকা গোলাপের মতো ছাপ, আমাদের উপস্থিতির তোয়াক্কা না করেই নিজের চালে এগিয়ে গেল।

অমরেন্দ্রবাবু অস্ফুটে বললেন,—চি-তা...!

—না অমরেন্দ্রবাবু, এটাকে লেপার্ড বলে। চিতা আলাদা জাতের।

—বলেন কী? চিতা আর লেপার্ড আলাদা? জন্মেও শুনিনি বাপু!

—শুনে রাখুন, চেনার সহজ উপায়—চিতার প্রতি চোখের কোণ থেকে একটা কালো রেখা নীচের দিকে নেমে আসে, অনেকটা কান্নার জল শুকিয়ে গেলে যেমন দাগ থেকে যায় তেমন। লেপার্ডের এমনটা থাকে না। আরও অবশ্য কিছু তফাত আছে, তবে তার থেকে এটাই সোজা উপায় চিনে নেওয়ার। আর আফ্রিকা কিংবা মধ্য-প্রাচ্যের কিছু দেশকে বাদ দিলে চিতার দেখা মেলে না, এদেশে তো একেবারেই না।

—অ! তা হবে হয়তো! কী জানি বাবা, এই বয়সে সব কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে দেখছি।

আমরা কোর এরিয়াতে না ঢুকে তার পাশ বরাবর চলেছিলাম, জঙ্গলের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের পাহাড়ি উপত্যকার সেই গুহার খোঁজে।

অবশেষে দিনের প্রায় শেষের দিকে আমরা এসে উপনীত হলাম এই গুহামুখের কাছে। সত্যি কী অদ্ভুত এই খোদাই করা প্রস্তর মূর্তি! মূর্তি দেখা মাত্রই মালপত্র নামিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকা আদিবাসীরা নতজানু হয়ে প্রণাম করে কাঁদুনি সুরে বিড়বিড় করে কীসব দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগল। দেখে মনে হল ওরা যতটা শ্রদ্ধার সঙ্গে ওরকম করছে, তার থেকেও বেশি ভয় কাজ করেছে যেন!

দিনের আলো না থাকায় সেই মুহূর্তে গুহায় ঢোকার মতো সাহস বা ইচ্ছা কিছুই আমরা দেখাইনি।

আর লেখা সম্ভব নয়, পেট্রোম্যাক্সের আলোয় জঙ্গলের যত কিম্ভূতকিমাকার পোকার দল এসে আমার তাঁবুতে ভিড় করছে, আমার চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাওয়ার জোগাড় এদের ঠ্যালায়। আজ এই অবধি থাক।

৯ জুন, ১৯৮১

আমি ভাবিনি যে এমন এক বিভীষিকা মাথায় নিয়ে আমায় ডায়েরি লিখতে হবে। জগতে কিছু জিনিস ঘটে যায় যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান হয়তো সব সময় দিতে পারে না। কিন্তু তবুও তো সেই সব ঘটনাকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। অপার রহস্যে ভরা এই মহাজগতের খুব সামান্য আমাদের চোখের সামনে আসে, তাই বেশি ভাগ রহস্যই অধরা থেকে যায় আমাদের কাছে।

৬ তারিখের ভোরে আমরা গুহায় প্রবেশ করার তোড়জোড় শুরু করি। আদিবাসী কুলিরা কিছুতেই রাজি হয় না গুহায় প্রবেশ করতে। অতঃপর দাশু, মংলু আর আমি প্রথমে গুহায় ঢুকি হাতে পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে, দাশুর সঙ্গে রাইফেল ছিল।

অমরেন্দ্রবাবুর আমাদের সঙ্গে ঢোকা হল না, তিনি তাঁর 'অহিপর্ণী' বুটিকার ক্বাথ লাগাতে এত দেরি করলেন যে তাঁকে ছাড়াই আমাদের গুহায় প্রবেশ করতে হল। তিনি বাইরেই থাকলেন তিঙ্কা আর কুলিদের সঙ্গে।

গুহার প্রবেশপথ প্রায় ৫x৩ ফুট। গুহায় ঢুকে কিছুটা এগোতে দেখা গেল স্টালাগ্মাইট ও স্টালাকটাইটের লাইমস্টোন দণ্ড কোথাও গুহার ছাদ থেকে আবার কোথাও মেঝে থেকে নেমে এসেছে বা উঠে গেছে। সাদা রঙের সেই সব প্রাকৃতিক আকৃতি ভারী অদ্ভুত।

দাশু দেখে বলল,—এরকম আকারে আসতে যে কত হাজার বছর লেগেছে তার ঠিক নেই, ৬০০ বছরে মাত্র ১ ইঞ্চি বাড়ে।

হেঁটে ভিতরে এগোতে গিয়ে এক জায়গায় টর্চের আলো পড়তে ঝকমক করে উঠল, দেখা গেল সেখানে দেওয়াল থেকে জল চুঁইয়ে হাঁটু গভীর একটি গর্তে জমেছে। তারমধ্যে দেখা গেল অদ্ভুত এক রকম মাছ, যার গাত্রবর্ণ সাদা। দাশু আবারও বলে দিল ওই মাছ সম্পর্কে। মাছটির গালভরা বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখতে অক্ষম থাকায় আমি নিজের মনে ওটিকে 'গুহামাছ' বা 'CaveFish' বলেই জায়গা দিয়েছি। মাছটির সব থেকে আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য হল সেটি অন্ধ এবং তার গায়ের রঞ্জক অনুপস্থিত। গুহার অন্ধকারে দেখার ক্ষমতা হারিয়েছে, এবং সৌর-রশ্মির অনুপস্থিতি দেহরঞ্জকের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ এখানেও বিবর্তন।

গুহা বরাবর প্রায় ৩০০ মিটার সুড়ঙ্গপথ গিয়ে দেখা গেল সুড়ঙ্গমুখ কূপের মতো নীচের দিকে টানা নেমে গেছে, গভীরতা আন্দাজ ৩৫-৪০ মিটার। আমরা বেরিয়ে এসে সঙ্গে থাকা কুলিদের জানালাম যে ভিতরের যা অবস্থা তাতে ওই কূপের মতো অংশে নামতে হলে আমাদের অস্থায়ী কপিকলের ব্যবস্থা করতে হবে। আর কপিকল লাগাতে গেলে সরঞ্জাম সঙ্গে থাকলেও আমাদের অবশিষ্ট ৫ জনের পক্ষে সেটা করে ওঠা সম্ভব নয় কখনোই।

অনেক বুঝিয়ে কপিকল অবশ্য বসানো গেল। কাঠের ডাল মাচার মতো বেঁধে তার চারিপাশ ঘিরে প্রায় আদালতের কাঠগড়ার মতো তৈরি করে সেটাকে প্ল্যাটফর্মের রূপ দেওয়া হয়েছে, তাকে মজবুতভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে কপিকলের সঙ্গে লাগিয়ে যেটা হল, সেটাকে অনেকটা লিফ্টের দেশি সংস্করণ বলা যেতে পারে। ওই ব্যবস্থায় একসঙ্গে ৪ জনের বেশি নামা যাবে না।

মোটা টাকার লোভ দেখানো হল আদিবাসী কুলিদের, কিন্তু কুলিরা জানিয়েছে কেউই গুহা কূপের মধ্যে নামবে না। ওদের বক্তব্য ছিল যে নাগদেবতার প্রাসাদে হানা দিলে মৃত্যু অনিবার্য, তিনি কুপিত হলে প্রাণ যাবেই।

ঠিক হল দাশু, আমি, অমরেন্দ্রবাবু, মংলু আর ভালু প্রথমে নামব কূপে,

বাইরে অপেক্ষায় থাকবে তিঙ্কা আর আমাদের কুলির দল। মংলুর কোমরে বাঁধা থাকবে একটি দড়ি, নীচে নামার পরে হঠাৎ বিপদ বুঝলে কিংবা এমনিই উঠে আসার দরকার পড়লে দড়ি ধরে জোরে টান দিলেই তিঙ্কা কুলিদের নিয়ে কপিকলের মাধ্যমে আমাদের তুলে আনবে।

গুহায় পেট্রোম্যাক্স নিয়ে আমরা ঢুকলাম, তাছাড়াও আমাদের প্রত্যেকের হাতে শক্তিশালী টর্চ আর দাশুর হাতে রাইফেল। অমরেন্দ্রবাবুকে সেই ছোট জায়গায় জমে থাকা জলে বর্ণহীন মাছ দেখাতে নিয়ে গিয়ে একটা বিপত্তি ঘটল। তিনি তাঁর স্বভাবগত অত্যুৎসাহ নিরসন করতে না পেরে ঝাঁপিয়ে দেখতে গিয়ে জলের মধ্যেই পড়ে গেলেন। তাঁর মাথা থেকে পা ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল।

মংলু তাঁকে ফেরত নিয়ে গেল গুহার বাইরে পোশাক বদলে আনার জন্য। প্ল্যান একটু বদলে ঠিক হল মংলু আর অমরেন্দ্রবাবুকে রেখে আমরা বাকিরা নামব, ওনারা তারপরে আসবেন, দড়ি বাঁধা থাকবে আমার কোমরে।

রওনা দিলাম নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে। সুড়ঙ্গমুখ কূপের মধ্যেও লাইমস্টোনের দণ্ড আমাদের দেশি লিফ্‌টকে বারবার বাধা দিলেও তল পেলাম অচিরেই।

বেশ বুঝলাম যেখানে নেমেছিলাম সেখান থেকে আরও একটা সরু গুহামুখ ধরে এগাতে হবে। ২০০-২৫০ মিটারের মতো হাঁটতে যে জায়গায় এসে পৌঁছোলাম সেটা একটা হলঘরের মতো। ছাদ অনেকটাই উঁচু, এধার-ওধার টর্চ মেরে চলেছিলাম। স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাটা, এখানেও লাইমস্টোন দণ্ডের কোনও অভাব নেই।

হঠাৎ একটা গা-হিম করে দেওয়া 'হিস হিস' শব্দ আর তার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে ভালুর সেই পরিচিত চাপা ক্রুদ্ধ 'গরগর' আওয়াজ। নিমেষের মধ্যে ভালু আমাদের কাছ থেকে ছুটে গেল সামনের দিকে। ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে কোনদিকে গেল বুঝতে পারার আগেই কানে এল ভালু 'কুঁইকুঁই' করছে। যেদিক থেকে আওয়াজ আসছে, সেদিকে দৌড়ে যেতে গিয়ে আমার হাতের পেট্রোম্যাক্স আছড়ে পড়ে ভেঙে গেল। দাশুর হাতের রাইফেল ছিটকে পড়ল দূরে। টর্চের আলো সামনে পড়তে যা দেখলাম তাতে মনে হল কালান্তক যম সামনে দাঁড়িয়ে।

আমরা প্রত্যেকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ভালু মাটিতে পড়ে যেখানে 'কুঁইকুঁই' করছে তার থেকে প্রায় ৫-৬ হাত তফাতে নিজের লেজে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা তুলে আছে এক মহাসর্প। শুধু মহাসর্প বলে এর বীভৎসতা বোঝানো সম্ভব নয়। গুহার বাইরের দেওয়ালে যে খোদিত মূর্তি দেখেছিলাম তার জীবিত রূপ দেখে কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

পাঁচটি মুখ বিশিষ্ট এই সর্পের গায়ের রং ফ্যাটফ্যাটে সাদা, আমাদের সবার টর্চের আলো গিয়ে পড়ছিল মহাসর্পের পাঁচজোড়া চোখের ওপরে। অতটা দূর থেকেও বৈদূর্যমণির মতো দ্যুতি ছিটকে আসা উপলব্ধি করছিলাম মহাসর্পর চোখগুলি থেকে। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম আমাদের ফেলা আলো মহাসর্পের ক্ষেত্রে কোনও প্রভাব ফেলছে না! এমনিতেই সাপ দেখতে পায় না। আর এই গুহায় থেকে এর দেহরঞ্জক প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে 'গুহামাছ'-এর মতোই।

'হিসহিস' আওয়াজটা প্রায় ঝড়ের মতো বেড়ে চলেছিল, আর পাঁচটি মুখ থেকেই চেরা জিভ বেরিয়ে যেন হাওয়ায় বুলিয়ে নিচ্ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম যে ভালু মহাসর্পের উপস্থিতি টের পেয়ে এদিকে আসতেই তাকে দংশন করেছে ওই মহাসর্প।

এতক্ষণ আমি একচুলও নড়িনি আর খেয়ালও করিনি যে দাশুর অবস্থান কী। দাশু শক্ত কাঠের মতো স্থির হয়ে আছে।

টের পেলাম মহাসর্প যেন আরও ফুঁসে ফুঁসে ফুলে উঠছে। নির্বিকারভাবে তার আকারপ্রকার বৃদ্ধি দেখা ছাড়া কোনও গতি ছিল না আমাদের। হয়তো রাইফেল থাকলেও তা কাজ করার আগেই নেমে আসত অমোঘ ছোবল, যার কবল থেকে স্বয়ং ঈশ্বরও আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না। মনে পড়তে লাগল ইহজীবনের প্রতিটি সুন্দর মুহূর্তের কথা। মনে মনে ভাবলাম অমরেন্দ্রবাবু যেন আর না আসেন মংলুকে নিয়ে, তাহলে অন্তত ওদের প্রাণ রক্ষা পাবে।

জানি না আমার এই আকাশ-পাতাল ভাবনার মধ্যে কত সময় কেটেছে। ওই মৃত্যুগুহায় তখন সব চরিত্র, যেন স্থবির ও মহাকালের কালদণ্ড নেমে আসার অপেক্ষায়। শুধু একটাই শব্দ 'হিস হিস, হিস...স...স...'।

হঠাৎ মৃত্যুপুরীর হিসহিসানি ছাপিয়ে মানুষের কণ্ঠ পেলাম।

—কোথায় গেলেন মশায়? বলি ও...ত্রিষাম্পতি বাবু-উ-উ-উ...!

স্পষ্ট বুঝতে পারছি চিৎকার করে সাবধান করে দিলে হয়তো প্রাণটা বেঘোরে যাবে না অমরেন্দ্রবাবু আর মংলুর। এটাও জানি সাপ কানে শুনতে পায় না। কিন্তু অদ্ভুত এক আতঙ্কে আমি বা দাশু কারো মুখেই আওয়াজ সরল না। ইতিমধ্যেই দেখলাম সেই বহুমুখী আতঙ্ক এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে, আরও আরও কাছে।

—কী করেন বলুন তো আপনারা? অ্যাঁয়া! এতক্ষণ ধরে ডাকছি। কী দাশুবাবু, নরাণাং মাতুলাং ক্রমায় শুনেছিলাম, আজ তো দেখছি তুমিও বদ্ধকালা, মামার মতোই।

এতক্ষণ আমার মুখে টর্চ ফেলে কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে গেলেন অমরেন্দ্রবাবু, খেয়াল করেননি সামনে কী ঘটে চলেছে। মংলু অবশ্য অবস্থা বুঝতে পেরেছে, আর ভালুর কেঁপে কেঁপে ওঠা দেহটা দেখতে পেয়ে বুঝে গিয়েছিল সব। আমার চোখের ইশারায় অমরেন্দ্রবাবু তাঁর বাগ্মিতা বন্ধ করে ঘুরে তাকালেন, একটা অস্ফুট শব্দ এল তাঁর মুখ থেকে—ওরে বাবা গো...'

কিছু বোঝার আগেই দেখলাম অমরেন্দ্রবাবু পাথরের মেঝেয় পড়ে গেলেন।

আমি ভাবলাম এবার বোধহয় কম্পন অনুভব করে মহাসর্পের ছোবল নেমে আসবে, কিন্তু অকস্মাৎ আমার সব ভাবনার উলটো ঘটল, মহাসর্প যেন ম্রিয়মান মনে হল, সেই ফোঁসফোঁসানি এক নিমেষে উধাও। চকিতে আমি দাশুকে ইঙ্গিত করতেই অমরেন্দ্রবাবুকে তুলে নিল, মংলুর টর্চের আলো আমাদের পথ দেখিয়ে আনল আমাদের দেশি লিফ্‌টের কাছে, আর আমার কোমরের দড়িতে দ্রুত টান দিয়ে দিয়ে ওপরে অপেক্ষারত তিঙ্কাকে বোঝাতেই ওরা আমাদের তুলে আনল।

তারপর আর সেখানে আমরা অপেক্ষা করিনি। ভালুকে আনার মতো সুযোগ ছিল না, তবু দুঃখ হচ্ছে যতই হোক ওর প্রাণটা গেল, ভালুও তো একটা প্রাণী।

আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারিনি সেদিন কীভাবে রক্ষা পাই, কিন্তু পরে মাথায় এসেছিল ব্যাপারটা। এ কোনও কাকতালীয় যোগ নয়। সাপেদের জিভে 'কেমিক্যাল রিসেপ্টর' থাকে, তাই তারা বারবার জিভ বের করে, সামনে উপস্থিত প্রাণীর 'কেমিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন' করতে। সেদিন অমরেন্দ্রবাবু জলে পড়ে যাওয়ার পরে যখন ফিরে গেলেন তখন মাথা ভিজে যাওয়ার ফলে আবারও বেশি করে কপালে 'অহিপর্ণী' বুটিকার প্রলেপ দেন। আসলে ওই বুটিকার ক্বাথই আসল কাজটা করেছে নিঃশব্দে। ওটার গন্ধে সাপও পালায় কপালের যন্ত্রণার মতোই।

আজ এই অবধি থাক, কাল সকালে কলকাতায় ফেরা। ওহ্, বলা হয়নি, অমরেন্দ্রবাবু সুস্থই আছেন, তবে বলছেন জ্ঞান থাকলে দেখে নিতেন ওই মহাসর্পকে।

কিশোর ভারতী কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলির (১৯৫৬) ৮নং ধারা অনুযায়ী বিবৃতি

১. **প্রকাশস্থান** ঃ ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

২. **প্রকাশকাল** ঃ মাসিক

৩. **প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নাম** ঃ ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

৪. **সম্পাদকের নাম** ঃ ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

জাতি ঃ ভারতীয়

ঠিকানা ঃ ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

৫. 'পত্র ভারতী'র পক্ষে যে সকল ব্যক্তি এই পত্রিকার মালিক এবং মোট মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশীদার, তাঁদের নাম ও ঠিকানা ঃ

শ্রীত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

সকলের ঠিকানা ঃ ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ আমি, ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১ মার্চ, ২০১৫

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক

সঞ্জীবনী সুধা মাতিয়ে দিল

এবারেও কলকাতা বইমেলার প্রথম রবিবার ছিল থইথই মানুষের ভিড়। তেমনই কানায় কানায় ভর্তি ছিল কলকাতা বইমেলার স্টেট ব্যাঙ্ক অডিটোরিয়াম।

কারণ একটাই। গত ১৯ বছরের মতো এই দিনটা ছিল কিশোর ভারতী পত্রিকা আয়োজিত এবং পত্র ভারতীর নিবেদনে লেখক-লেখিকাদের জমজমাট আড্ডা, নতুন-নতুন বই প্রকাশ আর কিশোর ভারতীর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান।

পয়লা ফেব্রুয়ারির এমন ত্র্যহস্পর্শযোগে ভরা বিকেল হাতছাড়া করে কেউ! বিশেষতঃ আমাদের একান্ত আপন বন্ধুরা।

মঞ্চে চাঁদের হাট। মধ্যমণি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। পাশে পরপর সুচিত্রা ভট্টাচার্য, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নবকুমার বসু, চণ্ডী লাহিড়ী, নির্বেদ রায়, নবীন চিত্রশিল্পী রাজীব পাল ও বর্ষীয়ান কবি ধূর্জটি চন্দ। স্টেজে সঞ্চালনায় ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পত্র ভারতীর পুরো টিম—শাশ্বত, অভিষেক, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চুমকি চট্টোপাধ্যায় এবং অনীশ দেব। সভাগৃহে আরও একঝাঁক লেখক—প্রচেত, উল্লাস, অভিজ্ঞান, সৈকত, কাবেরী...প্রমুখ।

'দীনেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' সুচিত্রা ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দিলেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। 'সাধনা স্মৃতি পুরস্কার' ধূর্জটি চন্দের হাতে তুলে দিলেন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চণ্ডী লাহিড়ী 'দিলীপ স্মৃতি পুরস্কার' দিয়ে আশীর্বাদ করলেন রাজীব পালকে।

পুরস্কার প্রাপকরা সকলেই আবেগতাড়িত। কিশোর ভারতীর সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার করলেন। সুচিত্রা ভট্টাচার্য বললেন, 'ছোটদের জন্যে এত লিখেছি, কোনও স্বীকৃতি পাইনি। কিশোর ভারতী আমায় ভালোবাসায় ভরিয়ে দিল।'

কবি ধূর্জটি চন্দের কথাতেও উঠে এল একই সুর। আর শিল্পী রাজীব তো উদ্‌গত আবেগে প্রায় কিছুই বলতে পারলেন না।

এরপরে বই-প্রকাশ অনুষ্ঠান ও আড্ডা। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বললেন পত্র ভারতীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধনের কথা। দুই বন্ধু নির্বেদ রায় এবং ত্রিদিববাবুর কথায় চলকে উঠল 'পুরানো সেই দিনের কথা।' দীনেশচন্দ্র এবং কিশোর ভারতীর সেইসব স্মৃতিমেদুর দিনগুলি, দীনেশচন্দ্রের আপসহীন দৃষ্টিভঙ্গি।

বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালক জানালেন, পত্র ভারতী এবারে নতুন ভাবনা নিয়ে এসেছে। সেটা হল, প্রবাসে সৃজনশীল তিন ব্যক্তিত্বের বই এই মঞ্চ থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে। বিশিষ্ট লেখক নবকুমার বসুর 'যুবরানি ডায়ানা', প্রতিশ্রুতিমান অভিজ্ঞান রায়চৌধুরীর 'ভৌতিক-অলৌকিক' এবং পেশায় সফল প্রযুক্তিবিদ রবীন্দ্র চক্রবর্তীর 'প্রবাসের আরও গপ্পো'। প্রথম দুজন বিলেত নিবাসী, তৃতীয়জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী।

সবশেষে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। অফুরন্ত রসসিক্ত স্মৃতি, দর্শন ও পাণ্ডিত্যের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল উপছে পড়া অডিটোরিয়ামের পাঠক বন্ধুদের। পিন-পড়া নৈঃশব্দ্য, মাঝে-মাঝে তুমুল হর্ষধ্বনি এবং হাততালি।

আমাদের দুঃখ একটাই। পরবর্তী অনুষ্ঠানের সময় এসে যাওয়াতে প্রায় মাঝপথে থামতে হল আমাদের প্রাণের মানুষকে। আকণ্ঠ সঞ্জীবনী সুধা পান করতে পারিনি।

নিজস্ব সংবাদদাতা

ফটো জয়ন্তকুমার বিশ্বাস

রাতুল দত্ত

হারিয়ে যাওয়া বাদ্যযন্ত্র

সালটা ১৯৭৩ কিংবা তার আশপাশ। 'আমার কর্দ' ছবির একটি দৃশ্য। ফেলিনির ছবি মানেই তার মধ্যে বিশেষ একটা কিছু থাকবে— থাকবে নতুন কিছু সুরের খেলা। এই ছবির মধ্যেও ছিল এমনই এক দৃশ্য। গ্রামের এক দৃষ্টিহীন বৃদ্ধ পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ানে এক মর্মবেদনার সুর বাজিয়ে চলেছেন অনবরত। উৎসবের রাত। আনন্দ-হই হুল্লোড়ের পর সবাই যে-যার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন। ওই বৃদ্ধ কিন্তু গভীর রাতেও একা সুরের জগতেই ডুবে রয়েছেন। একটা টুলের ওপর বসে বাদ্যযন্ত্রটায় বেলো করে আর রিড-এ আঙুল চালিয়ে না বলা অনেক কথাই যেন বলে যাচ্ছেন। চেষ্টা করলে, হয়তো পান্নালাল ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শৈলজারঞ্জন মজুমদারদের রেকর্ড পাওয়া যাবে, কিন্তু তখনকার অনেক বাজনার সুরই আর শুনতে পাওয়া যাবে না। অতীতের অনেক বাজনাই আজ জাদুঘরে চলে গেছে। পাশাপাশি এটাও ঘটনা, সানাই বা বাঁশির সুর শুনে অনেকেরই মন আর সেভাবে নেচে ওঠে না।

আসলে স্মার্ট ফোন, আই প্যাড, টাচস্ক্রিনের যুগে বা হোম থিয়েটারের জমানায় অনেক বাজনাই জনপ্রিয়তা হারিয়েছে বা ক্রমশ হারাচ্ছে।

বিরাট আকারের ঢাক, ঢোল, বীণা কিংবা সেতারের তারে ডুবে থাকতে আজ আর ক'জন চান? সত্যিই সুরের জগৎ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বহু ধরনের বাঁশি থেকে নানা ধরনের স্যাক্সোফোন।

বাজনার ইতিহাস এবং কালপ্রবাহ ঘাঁটলে দেখা যাবে, বহু বাজনা-ই এসেছে। আবার হারিয়েও গেছে তাদের সুর।

বাজনার ইতিহাস

বাজনা কেন এল পৃথিবীতে? এর একটাই উত্তর—সুর সৃষ্টির জন্য। কিন্তু এই সুর সবচেয়ে প্রথমে এসেছে মানুষের গলা থেকে। মানুষের হাসি, কান্না, চিৎকার, গর্জন ইত্যাদি হল সুরের প্রথম ধাপ। পরবর্তীকালে পাতার মর্মর ধ্বনি, নদীর কুলু কুলু শব্দ—ইত্যাদি থেকে মানুষ বুঝল যে অন্য কিছু থেকেও সুন্দর শব্দ তৈরি করা যায়। এল বাজনা। প্রথম দিকে ব্যাবিলনীয় বা মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় বাজনা তৈরি হত মানুষের জঙ্ঘাস্থি থেকে। আবার এখানকারই উর নগরীতে সোনার বৃষমুখ শোভিত এবং মণিখচিত ৯টি তারের একটি বাদ্যযন্ত্রের সন্ধান মিলেছে। মিশরের ফ্যারাও তুতেনখামেনের কবরেও কিছু বাদ্যযন্ত্রের সন্ধান মিলেছে। ভারতের দুই মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারতে যেমন বিভিন্ন রকমের বীণার উল্লেখ মেলে, তেমনি ইলিয়াড ও ওডিসিতে পাওয়া যায় হার্প।

ভারতের বিভিন্ন পুরাণে যে বাজনার উল্লেখ রয়েছে, সেটি প্রথম লিপিবদ্ধ করেছিলেন ভরত। তাঁর মতে, তারের বাজনা ছিল বিভিন্ন দেবতার প্রিয় বাজনা। চামড়া বা ঝিল্লি দিয়ে ঢাকা বাদ্য ছিল রাক্ষসদের প্রিয়। ঘনবাদ্য বা নাদবাদ্য ছিল কিন্নরদের প্রিয় বাজনা। আর ফুঁ দিয়ে বাজানো বাজনা হল গন্ধর্বদের প্রিয়। বলা হয় আমির খসরু প্রথম সেতার আনেন ভারতে।

ভারতীয় বাজনার মধ্যে যে বাজনাটির কথা প্রথমেই বলতে হয় সেটি হচ্ছে—বীণা। আমাদের দেশে এর এক রূপ, অন্যদেশে অন্যরকম। কিন্তু ধরা হয় বাঁশি এবং বীণা ভারতের সবচেয়ে পুরোনো বাদ্য। অন্তত ৮০-৮৫ ধরনের বীণার উল্লেখ আমরা পুরাণে পাই।

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে লেখা রামায়ণে মহর্ষি বাল্মীকি ৯টি তার বিশিষ্ট বিপঞ্চী বীণার উল্লেখ করেছেন—যা দশরথের রাজসভায় ব্যবহার করা হত। বিশিষ্ট গবেষক জি এন সুব্রহ্মণ্যমের মতে, অন্তত ৮২ রকমের বীণা ভারতেই প্রচলিত ছিল। এগুলি হল—খণ্ড বীণা, মারুদ বীণা, বন বীণা, নাখি বীণা, দৈব বীণা, কিন্নরী বীণা, রুদ্র বীণা, রাবণ বীণা, সরস্বতী বীণা, কচ্ছপী বীণা ইত্যাদি।

প্রাচীনকালের নানা ধরনের তারের বাজনা যেমন বিদেশে পাড়ি দিল, তেমনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতে এল বেহালা, গিটার, হারমোনিয়াম, অর্গ্যান, ম্যান্ডোলিন, ম্যান্ডোলা, টুবা, পিয়ানো, ক্ল্যারিনেট, করোনেট প্রভৃতি বাজনা। কিছু রইল টিকে, অনেকগুলোই গেল হারিয়ে। আবার আফ্রিকার কৃষ্ণকায়রা তালবাদ্যে দক্ষ। সেখান থেকে ভারতে এসেছিল বঙ্গো, কঙ্গো, থুম্বা, ঢোল, তাসা, কাড়া-নাকাড়া ইত্যাদি। আবার কদম্ব, নন্দী, কলসতাল, নন্দীঘোষের মতো হারিয়ে যাওয়া বাজনা ছিল বৌদ্ধযুগের।

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় মার্গ সংগীতে নানা ধরনের বাজনার প্রচলন হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকগুলি যেমন একেবারে হারিয়ে গেছে, তেমনি কিছু নতুন বাজনাও তৈরি হয়ে এসেছে। আজ পর্যন্ত ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) ঘন বাদ্য বা নাদ বাদ্য (Idiophone) ঃ শুধু ভারত নয়, সারা পৃথিবীতেই নাদবাদ্য বহু প্রাচীন। নাদ অর্থাৎ যা থেকে গম্ভীর শব্দ বা সুর উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ভারতের অনেক মন্দির রয়েছে, যেগুলির স্তম্ভের গায়ে টোকা দিলেই সুন্দর সুর মূর্ছনা সৃষ্টি হয়।

ঘন বাদ্য বা নাদ বাদ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জলতরঙ্গ, কাষ্ঠ তরঙ্গ, প্রস্তর তরঙ্গ, লৌহ তরঙ্গ ইত্যাদি। এছাড়াও কাঁসর, ঝুমঝুমি, টুঁড়িয়া, গরবা লাঠি, কাষ্ঠবীণা, থালি, কলসিবাদ্য উল্লেখযোগ্য। কিছু প্রাচীন মন্দির ছাড়া এখন আর এইসব ঘনবাদ্যের ব্যবহার প্রায় হয়-ই না।

(ক) জলতরঙ্গ—বিভিন্ন সাইজের চিনামাটির খুরির মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণ জল ভরে রেখে দুটি কাঠি দিয়ে ঠুকে সুন্দর শব্দ তৈরি হয়। মহারাষ্ট্রে একজন বিশিষ্ট জলতরঙ্গ বাদক ছিলেন, তাঁর নাম মনোহর বার্ভে। চিনে জলতরঙ্গ একসময় ব্যবহার হলেও এখন অনেক কম বাজানো হয়।

(খ) কলসি বাদ্য—মাটি ও পিতলের তৈরি লম্বা কলসিকে বাদ্য হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন সুপ্রাচীনকাল থেকে। কাশ্মীরে এই কলসি বাদ্যের নাম 'নুট', একই বাদ্য গ্রিসে পরিচিত 'অ্যামফোরা' নামে। বহু রাজ-রাজা এবং নবাবদের দরবারে কলসি বাদ্য বাজানো হত। দক্ষিণ ভারতে 'ঘটম' নামে একটি বাজনা দেখতে পাওয়া যায়, ঘটকবাদক খালি পায়ে পেটের ওপর এই কলসি বসিয়ে বাজান।

(গ) থালি বাদ্য—বহু পুরোনো এক বাদ্যযন্ত্র—দেখতে বিরাট থালার মতো কাঁসা বা পিতলের তৈরি—হাত বা লাঠি দিয়ে বাজানো হয়। উত্তর ভারতে এর নাম থালি, অন্ধ্রে দশারি; তামিলনাড়ুতে সেম্মান নামে পরিচিত এই বাজনা। তবে এই বাজনাও দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে।

(২) অবনদ্ধ বা আনদ্ধ বাদ্য (Membranophone) ঃ যে সমস্ত বাজনা চামড়া বা ঝিল্লি দিয়ে ঢাকা, তাদের অবনদ্ধ বাদ্য বা বাজনা বলে। বোঝাই যাচ্ছে, কাঠ বা মাটির কাঠোমোর ওপর চামড়া দিয়ে মোড়া ঢাক-ঢোল জাতীয় বাজনা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

যেমন, ডমরু, ঢোলক, ঢাক, খোল, শ্রীখোল, নাদনিন মাদল, মৃদঙ্গ, পঞ্চমুখ বাদ্য, দুন্দুভি, পাখোরাজ ইত্যাদি। কিছু ঢাক জাতীয় বাদ্য যেমন হাত দিয়ে বাজানো হয়, তেমনি কিছু বাদ্য হাত ও স্টিক ব্যবহার করে বা শুধু স্টিক ব্যবহার করেও বাজানো হয়।

আমাদের দেশে অনেক গ্রামে হাঁড়িকে অবনদ্ধ বাজনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটাও বেশ মজার ঘটনা। মহারাষ্ট্রের দইয়ের হাড়ির বাজনার নাম 'সম্বল', উত্তর ভারতে এটাই 'তাসা', তামিলনাড়ুতে 'তামুক'।

(৩) ফুৎকার বাদ্য (Aerophone) ঃ ফুঁ দিয়ে শব্দ তৈরি করা মানুষের বহু প্রাচীনকালের অভ্যাস। সেই হিসেবে বলতে গেলে শিস দেওয়া থেকেও শব্দ তৈরি হয়।

আবার গভীর বনের ফাঁপা বাঁশ কেটে এনে তার মধ্যে তীক্ষ্ণ শব্দ তৈরির চেষ্টা করা হয়। আবার অর্গ্যান, হারমোনিয়াম, অ্যাকর্ডিয়ন ইত্যাদি যন্ত্র হাপর দ্বারা বাজানো হয়। ফুঁ না দিলেও হাওয়া দিয়ে বাজানো হয় বলে একে ফুৎকার বাদ্য বলে।

ফুৎকার বাদ্য সাধারণত দুই প্রকার এবং এদের অনেকগুলিই অস্তিত্বের সংকটে। বিভিন্ন ধরনের বাঁশিতে যেমন ঘাট থাকে, তেমনি বাজনার মুখেও পাতলা ফলক দেওয়া থাকে। ভেরি, শিঙ্গা, ভেপু ইত্যাদি এই ধরনের বাজনা। ভারতে তো বটেই, বিভিন্ন দেশের আদিবাসীরা পশুর অস্থি বা ফাঁপা গাছের শাখা, শিং ইত্যাদি ফুঁকে বাজনা হিসেবে ব্যবহার করেন।

ফুঁ দিয়ে বাজানো বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেগুলি অস্তিত্বের সংকটে, সেগুলি হল বিভিন্ন ধরনের শিঙ্গা, বাঁশি এবং ভেরি। গুজরাটের সর্পাকৃতি নাগফণী বাজনা আজকাল আর প্রায় দেখাই যায় না। ভেরি শুধুমাত্র দেখা যায় ওড়িশা এবং কর্ণাটকে—তাও অন্য নামে। এখানে ভেরি কাহাল নামে পরিচিত। আবার তিব্বত, লাদাখ এবং ভুটানের পার্বত্য অঞ্চলে এবং সুইজারল্যান্ড ও জার্মানিতে একসময় ব্যবহৃত নানা ধরনের তুরি আজ ইতিহাসের পাতায়। দেখা যায় না, রামশিঙ্গা এবং বোম বাঁশিও।

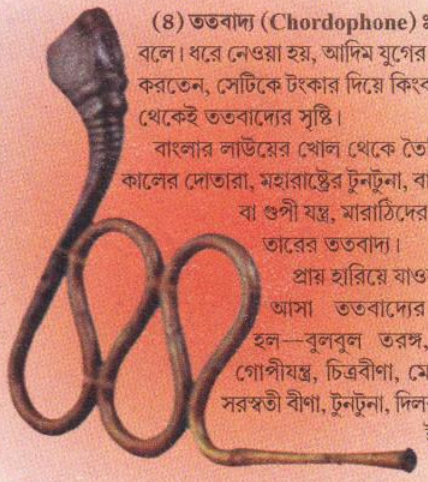

(৪) ততবাদ্য (Chordophone) ঃ তারের যন্ত্রকে ততবাদ্য বলে। ধরে নেওয়া হয়, আদিম যুগের মানুষরা যে ধনু ব্যবহার করতেন, সেটিকে টংকার দিয়ে কিংবা বাদ্য হিসেবে ব্যবহার থেকেই ততবাদ্যের সৃষ্টি।

বাংলার লাউয়ের খোল থেকে তৈরি একতারা বা পরবর্তী কালের দোতারা, মহারাষ্ট্রের টুনটুনা, বাউলগোষ্ঠীর প্রেম লহরী বা গুপী যন্ত্র, মারাঠিদের চোংকা বিশেষ ধরনের তারের ততবাদ্য।

প্রায় হারিয়ে যাওয়া বা দ্রুত ব্যবহার কমে আসা ততবাদ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—বুলবুল তরঙ্গ, দোতারা, একতারা, গোপীযন্ত্র, চিত্রবীণা, মোহন বীণা, নকুল বীণা, সরস্বতী বীণা, টুনটুনা, দিলরুবা, সুরশৃঙ্গার, গুবগুবা ইত্যাদি।

এবার আসি, হারিয়ে যাওয়া বা দ্রুত কমে আসা বেশ কিছু বাজনা প্রসঙ্গে—

বীণা

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাসে অন্যতম সম্মানীয় স্থান দখল করে আছে যে বাদ্যযন্ত্র, সেটি বীণা। বিদ্যার দেবী সরস্বতীর হাতের বাদ্যযন্ত্র দেখলেই বোঝা যায়, সুপ্রাচীন ঋগ্বেদের যুগেই এর প্রচলন ছিল। তবে পরবর্তীকালে বীণার নানা রূপ আমরা দেখি, যেমন—মোহন বীণা, রাবণ বীণা, কলাবতী বীণা, গাত্র বীণা, ব্রাহ্মী বীণা, ঘোষিকা বীণা, তাম্বুর বীণা, সরস্বতী বীণা, রুদ্র বীণা, চিত্র বীণা প্রভৃতি।

অনেকে বলেন, প্রাচীন ভারতের বীণা এসেছে গ্রিসের তার বাদ্য হার্প থেকে। পরবর্তীকালে বীণা থেকে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে আজকের গিটার। প্রাচীন ভারতের বীণা একসময় ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে। উত্তর ভারতে এর নাম হয় রুদ্র বীণা আর দক্ষিণ ভারতে সরস্বতী বীণা। গুপ্তযুগে নাট্যশাস্ত্রে বীণার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। সমুদ্রগুপ্ত যে সুন্দর বীণা বাজাতেন, সে সময়কার মুদ্রা হল তার প্রমাণ।

রুদ্র বীণা

ভারতের সনাতনী সংগীতশাস্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। দৈর্ঘ্য হয় ৫৪-৬২ ইঞ্চি এবং দুপাশে দুটি সমান মাপের গোল অংশ থাকে। নাম শুনেই বোঝা যায়, রুদ্র বীণা হিন্দুদের দেবতা শিবের খুব প্রিয়। ১৯ শতকের প্রথম দিকে যখন 'সুরবাহার' নামে অপর বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব হল, রুদ্র বীণার ব্যবহার গেল কমে।

চিত্র বীণা

দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে ১৮-১৯ শতকে এই বীণার প্রচলন হয়। একে হনুমদ বীণা, মহানাটক বীণা, গোট্টুবাদ্যও বলা হয়। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত এই যন্ত্র এখনও দক্ষিণ ভারতেই সীমাবদ্ধ।

পাম্ভুরা

গ্রিসদেশে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় অব্দে এর উৎপত্তি—যা রূপে পরিবর্তিত হয়ে আজও সেদেশে অল্প হলেও বাজানো হয়। মেসোপটেমিয়া সভ্যতায়ও এর নানা উল্লেখ রয়েছে। মাঝের দণ্ডটি খুব লম্বা এবং নীচের তাম্বুরা খুব ছোট। এতে তার মূলত ৩টি। উত্তর আফ্রিকায় এর নাম কুইট্‌রা, গ্রিসে বর্তমান নাম বউজউকি, মধ্যপ্রাচ্যে স্যাজ।

হার্প

ভারতে যেমন প্রাচীন বাদ্য হল বীণা, তেমনি গ্রিক ও রোমানদের হার্প। বিভিন্ন আকারের হার্প বাজানো হত এক সময়। কোনওটি ত্রিভুজের মতো, কোনওটি চতুর্ভুজ আবার কোনওটি লম্বা। এর তার মূলত সিল্ক দিয়ে তৈরি হয়। হার্প কিন্তু এশিয়ার বাদ্য নয়। বরং ইউরোপ এবং আমেরিকার বহু দেশের লোকসংস্কৃতিতে মিশে থাকা হার্প—তার গঠন পরিবর্তন করেই চলেছে।

ডমরু

পুরাণে বলা হয়, ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করতে নাকি এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। শিব নিজেও এই বাদ্যে বিশেষ পারদর্শী। তবে এই বাদ্যের উৎপত্তিস্থল তিব্বতের বৌদ্ধ সম্প্রদায়। ৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ২৫০-৩০০ গ্রাম ওজনের এই ডমরু নাকি সবচেয়ে ভালো হয় মানুষের মাথার খুলি দিয়ে তৈরি করলে! একজন পুরুষ এবং একজন নারীর খুলি মাঝখান দিয়ে জুড়ে তৈরি হয় আদর্শ ডমরু। যা-ই হোক, পরবর্তীকালে নেপাল ও চিনে ছড়িয়ে পড়ে এই বাজনা। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের বেশ কিছু গবেষণা বলছে, ভারতে গত শতকেও ডমরুর ব্যবহার ছিল।

খোল

মূলত মাটির তৈরি এবং বাংলায় বৈষ্ণবদের বহু পুরোনো এক বাদ্যযন্ত্র—যা আজকাল আর প্রায় দেখাই যায় না। টেরাকোটার তৈরি বাইরের অংশ এবং দুপাশেই বাজানো যায়। এটিকে এক ধরনের বিশেষ ড্রামও বলা হয়—যা শুধুমাত্র আঙুল ও হাতের চাপড়েই বোল তোলে। তবে খোলের একমুখ অন্যদিকের মুখের তুলনায় অনেকটাই ছোট হয়। খোলে যেটুকু কাঠের অংশ থাকে—তা শাল কাঠ থেকেই তৈরি হয়।

বাংলা ও ওড়িশার কীর্তনে খোল ব্যবহার প্রায় বাধ্যতামূলক হলেও এখন আর প্রায় দেখাই যায় না।

সরোদ

আলাউদ্দিন খাঁ, আলি আকবর খাঁ কিংবা বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের মতো সরোদ বাদক আজকের দিনে আর তৈরি হবে কি না সময়ই বলবে। কিন্তু সরোদকে ভালোবেসে সুরের জগতে ডুবে থাকতে আজকের দিনে ক'জন আসছেন, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

পার্সি ভাষায় সরোদ শব্দের অর্থ 'সুন্দর সুর' বা 'সুরের লহরী'। বলা যায়, আফগান রবাব থেকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে ভারতে এসেছে সরোদ। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব লালমণি মিশ্র তাঁর 'ভারতীয় সংগীত বিদ্যা' বইতে সরোদের উৎস সন্ধানে লিখছেন, প্রাচীনযুগে চিত্র বীণা, মধ্যযুগে রবাব আর আধুনিক যুগের সুরসিংগার—এই তিন বাজনার মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছে সরোদ।

দোতারা

রাঢ় বাংলার মাটিতে আজও কান পাতলে শোনা যায়, দোতারার শব্দ। কিন্তু সেই শব্দও আধুনিকতার গ্রাসে অস্তিত্বের সংকটে। ১৫-১৬শ শতকে অসম, পশ্চিমবঙ্গ তথা অবিভক্ত বাংলাদেশ এবং বিহারের বাউল ও ফকিররা নিজেদের বাজনা হিসেবে দোতারাকে হাতে তুলে নেয়। বাংলার লোকসংগীতে দোতারার ভূমিকা অসামান্য।

রাঢ় বাংলার গানেও একসময় ভীষণরকম দোতারার ব্যবহার থাকলেও আজ আর সে গান শোনা যায় না। বলে রাখা ভালো—দো-তারার দুই তার। অর্থাৎ

দুই তারের বাজনা। মোটা সুতি, সিল্ক কিংবা মেষ জাতীয় প্রাণীর অন্ত্র থেকে তৈরি হয় এই তার।

তার-সানাই

শুনতে সানাই-এর মতো মনে হলেও দেখতে সম্পূর্ণ এসরাজ। আর শব্দ অনেকটা বেহালার মতো। 'পথের পাঁচালি'-তে দুর্গা যখন মারা গিয়েছে —হরিহর এবং সর্বজয়া কাঁদছেন, সত্যজিৎ রায় নেপথ্যে এই তার-সানাইয়ের সুর ব্যবহার করেছেন।

তানপুরা

তারের লম্বা গলার এক বাদ্যযন্ত্র, যা মূলত অন্য বাজনার সাহায্যকারী বা পরিপূরক হিসেবে বাজানো হয়। তানপুরার সুর যেন এক নিরন্তন মূর্ছনা। আসলে 'তান' শব্দটি এসেছে সুরের বিভিন্ন অংশ থেকে। আর পুরা অর্থ —পূরণ। সুর, তাল, লয়, ছন্দকে যে বাজনা পূরণ করার ক্ষমতা রাখে, সে-ই তানপুরা। তবে যেহেতু বাজানো কঠিন এবং শিখতেও সময় লাগে—এটিও তাই আজ ক্রমশ অস্তিত্বের সংকটে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রানাডের মতে, মোগলযুগে সম্রাট আকবরের দরবারে এই বাজনাকে নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে।

রবাব/ রুবেল

তারের এই বাদ্যযন্ত্রকে অনেকে বলেন, রুদ্রবীণার রূপান্তর। আবার ইসলাম গবেষকদের মতে, আরব দেশেই এর উৎপত্তি। পরবর্তীকালে ইসলাম বাণিজ্যের পথ ধরে উত্তর আফ্রিকা-মধ্য পূর্ব এশিয়া-ইউরোপ হয়ে পূর্বে ছড়িয়ে পড়ে। পালটে যায় তারের সংখ্যাও। এর কোনো কি-বোর্ড নেই। প্রায় হারিয়ে গেলেও আরব বেদুইন এবং মধ্যপ্রাচ্যের কিছু জাতির মধ্যে এই বাজনা এখনও সামান্য বেঁচে রয়েছে।

মঙ্গলকাব্যে বাংলার বাদ্যযন্ত্র

বিষয় হিসেবে এটি গবেষণার বস্তু হতে পারে। ভাবতে অবাক লাগে, চর্চার অভাবে সত্যিই বাংলার বুক থেকে কত ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারিয়ে গেছে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বাইশ কবির পদ্মপুরাণ ইত্যাদি যখন বাংলার বুকে লেখা হচ্ছে—তখন সেই সব লেখায় বাজনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সবগুলির গঠন জানা এবং কীভাবে বাজানো হত—তা বোঝা সত্যিই কঠিন।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে উল্লেখিত বাদ্যযন্ত্র

দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বংশী, বীরঢাক, বরগা শিঙ্গা, পঞ্চশব্দী, কাহাল, করতাল, মন্দিরা, কাড়া, জয়শঙ্খ ইত্যাদি।

ধর্মমঙ্গল ও পদ্মপুরাণে উল্লেখিত বাদ্যযন্ত্র

দোতারা, সেতার, পিনাক, জয়ঢাক, দগড়, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, বীরঘণ্টা ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন ধরনের বীণার উল্লেখ। এদের মধ্যে পিনাকি এবং বল্লভী-বীণা গুরুত্বপূর্ণ।

হারিয়ে যাওয়া বিদেশি বাজনা

আমাদের দেশ থেকে যেমন অনেক বাজনা হারিয়ে গেছে বা দ্রুত কমে যেতে বসেছে, বিদেশের মাটি থেকেও হারিয়ে গেছে বহু বাদ্যযন্ত্র। এদের কয়েকটির সঙ্গে পরিচয় করা যাক।

অংক্লুঙ্গ (Aagklung) ঃ যবদ্বীপের পার্বত্য জাতির মধ্যে প্রচলিত এক বাদ্যযন্ত্র—যা কতকগুলি বাঁশের নল দিয়ে তৈরি। শুধু যবদ্বীপ নয়, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন বাজনার মধ্যে এটি খুবই পুরোনো এবং এখন প্রায় দেখাই যায় না।

অকটাকর্ডাম (Octachordum) ঃ গ্রিস দেশের বিশেষ এক বীণা জাতীয় বাদ্য—যা সম্ভবত গ্রিক দার্শনিক এবং গণিতজ্ঞ পিথাগোরাস বাজাতেন।

গিত্তার্ন (Gittarun) ঃ মধ্যযুগের এক গিটার। সেসময় একটুকরো কাঠ কেটেই এটি তৈরি হত। তার হিসেবে ব্যবহার করা হত প্রাণীর অন্ত্র। ১৮ শতক পর্যন্ত ইউরোপে এটি প্রচলিত ছিল।

হার্পসিকর্ড (Harpsichord) বা স্পিনেট (Spinet) ঃ ১৮ শতকের আগে যে যন্ত্রটি ছিল হার্পসিকর্ড, পরে সেটির নাম হয় স্পিনেট। নানা দেশে নানা নামে পরিচিত এই বাদ্যযন্ত্রে অনেক চাবি থাকে। সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে একটি স্পিনেট ছিল এবং এটি বাজিয়ে তিনি নিজের ছবির সুর রচনা করতেন।

মারিম্বা (Marimba) ঃ মধ্য আমেরিকায় প্রচলিত এক ধরনের বড় কাষ্ঠবীণা। প্রথমে আফ্রিকাতে প্রচলিত থাকলেও পরবর্তীকালে মেক্সিকোতে এই বাজনা চলে আসে। লাঠির আঘাতে বাজানো হয় এবং চারজন বাদক একসঙ্গে এই যন্ত্র বাজান।

হাজুর (Hazur) ঃ প্রাচীন মিশরের এক প্রকার ত্রিভুজাকৃতি বাদ্যযন্ত্র। বিশেষ করে ইহুদিদের খুব প্রিয় এবং বাজনায় ১০টি তার থাকে।

সি শেল (Sea Shell) ঃ একসময় মেক্সিকানদের অতি প্রিয় শঙ্খ জাতীয় এই বাদ্য আজ আর প্রায় দেখাই যায় না।

রিল্চ (Rilch) ঃ ভারতের সীমানা পেরিয়ে রাশিয়াতেও পৌঁছে গিয়েছিল ভারতীয় বীণা। একে সেদেশে রিল্চ বলা হত। পরবর্তীকালে হারিয়ে যায় এটি।

ম্যাম (Mam) ঃ প্রাচীন মিশরীয়দের ব্যাগ পাইপ জাতীয় দুই নল বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। মিশরীয় রমণীদের অতি প্রিয় ছিল এই বাজনা—যেটা নামের মধ্যেই প্রকাশ্য। ব্রিটিশ যাদুঘরে এরকম একটি বাদ্যযন্ত্র রয়েছে।

ডফ বা ডেফ (Doff or Deff) ঃ মূলত আরবদেশে প্রাচীনকাল থেকেই এই বাজনা প্রচলিত ছিল। দেখতে চতুষ্কোনাকায় এবং মেষের চামড়ায় ঢাকা।

হারিয়ে যাওয়া কিংবা প্রায় হারাতে বসা অনেক বাজনার সঙ্গে তো পরিচয় ঘটল। কিন্তু এই বাজনা সংরক্ষণে বা বাঁচিয়ে রাখতে কি বিশেষ কিছু উদ্যোগ নেওয়া যায় না!

কিশোর ভারতী

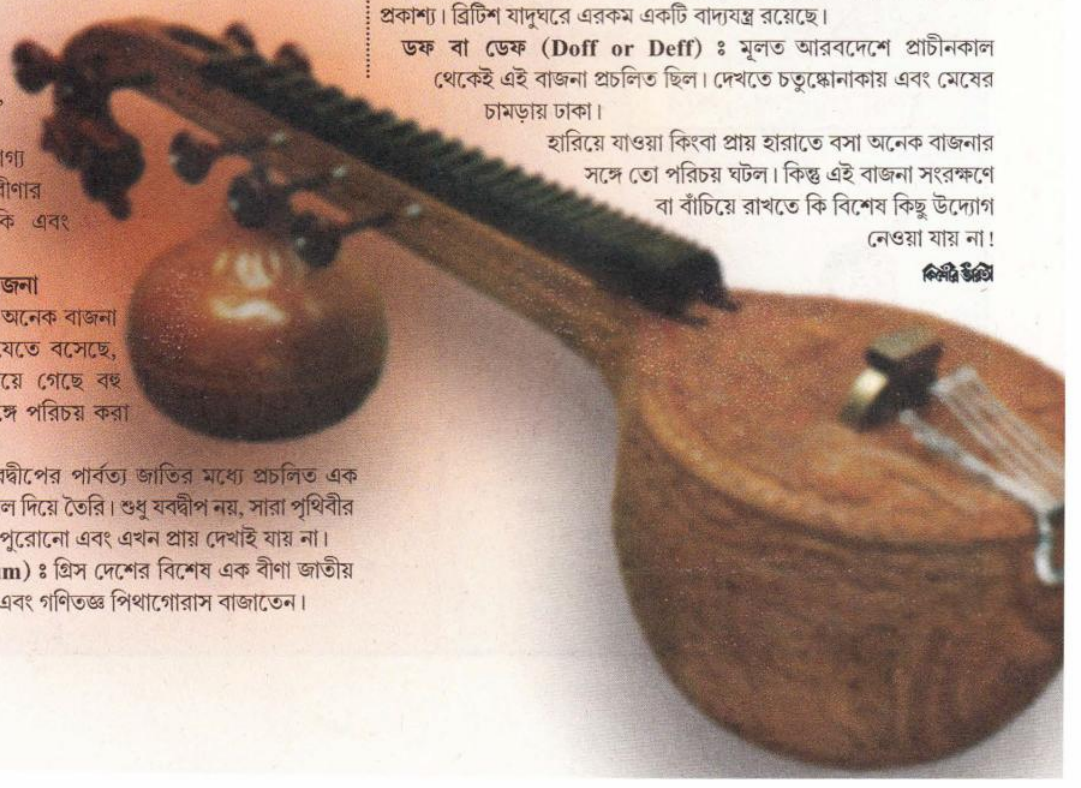

গত সংখ্যার পর

মাথা খাটানোর মুশকিল

সূত্র শিবরাম চক্রবর্তী
চিত্রনাট্য ও সংলাপ
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
ছবি সুদীপ্ত মণ্ডল

মাথা খাটানোর মুশকিল

সূত্র শিবরাম চক্রবর্তী
চিত্রনাট্য ও সংলাপ
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
ছবি সুদীপ্ত মণ্ডল

ক্রমশ

গল্প

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

রাস্তা যখন শেষ

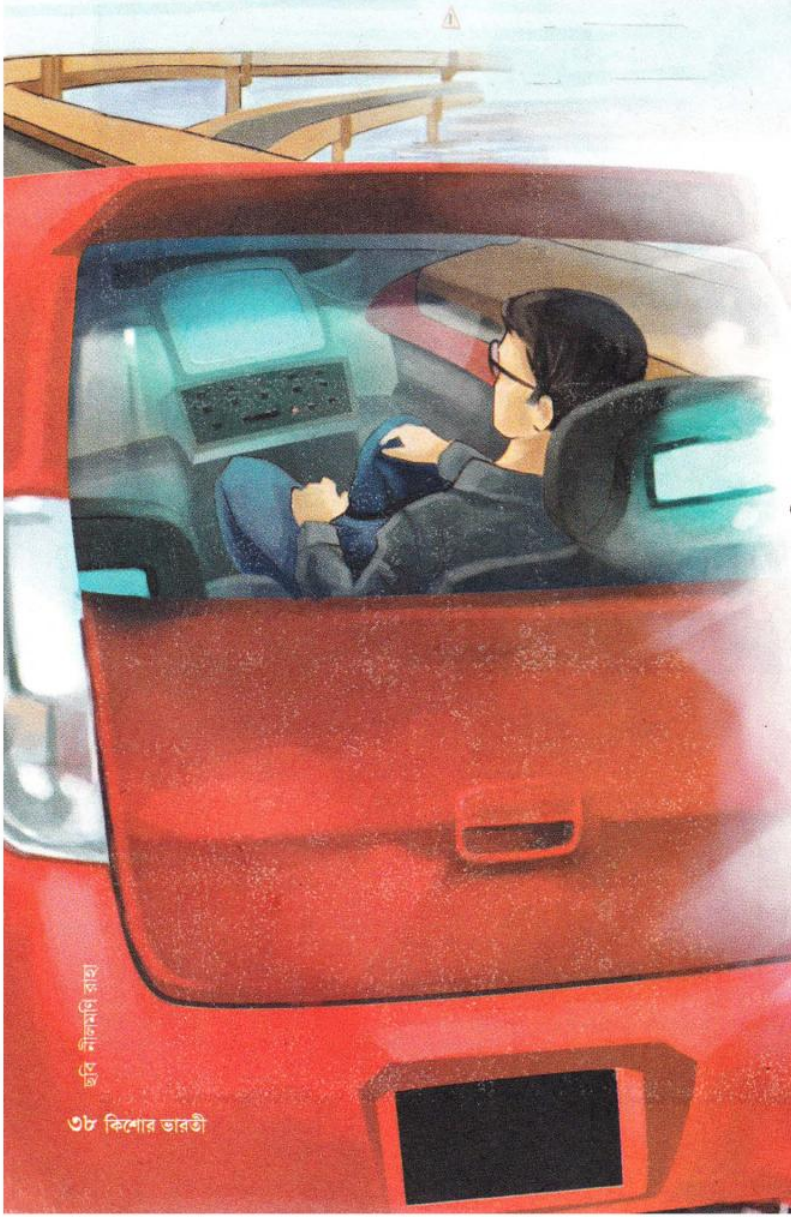

ছবি: নীলমণি রাহা

দমদম সেন্ট্রাল জেলের ৩ নং সেলের বাসিন্দা পুলক জোয়ারদারকে চেনে না এমন লোক বাংলা কেন ভারতেও কম। গত পাঁচ বছর জেলে থাকলেও খুব কম দিনই গেছে যেদিন পুলককে নিয়ে কোনো কাগজে কোনো রকম আলোচনা হয়নি। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, সব ঋতুতেই প্রায় একইভাবে পুলকের নাম খবরের কাগজের পাতায় ঘুরে ফিরে এসেছে—কখনো পক্ষে, কখনো বিপক্ষে।

অবশেষে আদালতের রায়। পুলকের মুক্তির আদেশ। পুলকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি। কোনো সাক্ষীও পাওয়া যায়নি যার এতটা বুকের পাটা আছে যে পুলকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। শেষে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। পাঁচ বছর বাদে সবরকম অপরাধ থেকে বেকসুর খালাস। অবশ্য এটাও ঠিক যে কয়েকটা রাজনৈতিক দল পুলককে জেল থেকে বের করে নিজের দলে টানার জন্য যে ভাবে কোমর বেঁধে নেমেছিল তাতে ওর কৃতকর্মের কালো দাগগুলো মিডিয়ার কল্যাণে আস্তে আস্তে ফিকে হতে শুরু করেছিল। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষও ভুলতে শুরু করেছিল। এমনকী সেই ঘটনাটাও ভুলে গিয়েছিল যেখানে পুলক ও পুলকের পোষা গুণ্ডাবাহিনী বৈদ্যপাড়া গার্লস স্কুলের মধ্যে ঢুকে তিনজন শিক্ষিকা আর বারোজন ছাত্রীকে বোমা ছুড়ে মেরেছিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সবই ভুলে যায়। বিশেষ করে পালের হাওয়া যখন মানুষকে ভুলতে বাধ্য করে। পুলককে সঙ্গে পেলেই অনেক পার্টির ভোটব্যাঙ্কে বড় প্রভাব পড়বে। তাই কে ওকে কাছে টানতে পারে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে।

তবু কেউ কেউ থাকে যারা এ ধরনের ঘটনা চট করে ভুলতে পারে না, যেমন লিপির বাবা। ওই স্কুলে বোমা বিস্ফোরণে যে বারোজন নিরাপরাধ ছাত্রী মারা গিয়েছিল তার মধ্যে লিপিও ছিল। হঠাৎ করে একটা দিন লিপির বাবা অশোকবাবুর জীবন পালটে গিয়েছিল। একটা বড় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল যা আর কখনো পূর্ণ হওয়ার নয়।

সেই দিনটাকে কোনোদিন ভুলতে পারেননি অশোকবাবু, ক্ষমা করতে পারেননি পুলককে। হয়তো আগামী দিনে আরও অনেক স্কুল পুলকের তাণ্ডবের শিকার হবে। দূর থেকে তাই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অশোকবাবু।

পুলকের জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কথা অনেকেই জানে। তাই জেলের বাইরে মিডিয়া, সাধারণ লোকের বেশ ভালোই ভিড়। পুলকের দলবলও মালা আর সংবর্ধনার নানা সরঞ্জাম নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিল।

ঠিক সকাল দশটা বাজতে পাঁচে পুলক জেলের গেটের বাইরে বেরিয়ে এল। লম্বা-চওড়া চেহারা। ডান হাতের দু-আঙুলে ভিকট্রি সাইন দেখিয়ে মিনিট দুয়েক জেলের গেটের সামনে দাঁড়াল। ভক্তরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। অজস্র ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল। পুলকের মুখে মুচকি হাসি। দেখেই বোঝা যায় জেলের মধ্যেও যত্ন-আত্তির তেমন অভাব হয়নি। জেলের ভেতরে থেকেও বাইরের পৃথিবীটাকে চালাতে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি পুলককে।

অশোকবাবু নিরীহ লোক। কোনোদিনই পুলকের কাছাকাছি পৌঁছোতে পারবেন না। ওনার যন্ত্রণা, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কখনোই কেউ শুনতে পাবে না। এটা যেন হঠাৎ করে আরও বেশি করে মনে পড়ে গেল অশোকবাবুর। রাগে, আক্রোশে রাস্তায় পড়ে থাকা একটা ছোট পাথর তুলে পুলককে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় ওনার কাঁধে কে যেন হাত রাখল।

ঘাড় ঘুরিয়ে অশোকবাবু দেখলেন পাশে একটা ছোটখাটো লোক এসে দাঁড়িয়েছে। সে-ই হাত রেখেছে অশোকবাবুর কাঁধে। লোকটার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। উজ্জ্বল দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে কী ছিল কে জানে। তবে অশোকবাবু মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পেরে থেমে গেলেন। আস্তে করে হাতে তোলা নুড়ি পাথরটা রাস্তাতেই ফেলে দিলেন। লোকটা ওনাকে ছেড়ে সামনের ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

২

পুলক আর মিঃ খেমকা সুইমিং পুলের ধারে বসে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করছিল। পুলকের ছাড়া পাওয়া উপলক্ষ্যে পার্টি। মিঃ খেমকা সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী। পুলক যে বিশাল হাউজিং প্রজেক্টটা করতে চলেছে তা মিঃ খেমকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য ছাড়া ঠিকভাবে করা অসম্ভব। বিশেষ করে তা যখন বিতর্কিত জমির ওপর তৈরি হতে চলেছে। সে ব্যাপারেই আলোচনা হচ্ছিল।

পুলকের ডিনার পার্টিতে শুধু মিঃ খেমকা নন, প্রভাবশালী মন্ত্রী, আমলা, তথাকথিত সেলিব্রিটি, মিডিয়া, গুণ্ডাসমাজ সবেরই প্রতিনিধি আছে। বাগানবাড়ির সামনের রাস্তায় জানা-অজানা অজস্র বিদেশি গাড়ির ভিড়। সিকিউরিটির বাড়াবাড়ি এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে অত্যন্ত প্রভাবশালী লোক ছাড়া কারোর পক্ষে এ বাড়ির দরজা পেরোনো সম্ভব নয়।

ঠোঁটের কোণে চুরুটটা ধরে মিঃ খেমকাকে লক্ষ্য করে পুলক বলে উঠল, ২০১৭ থেকে ২০২২—এই পাঁচ বছরে সত্যি সবকিছু অনেক বদলে গেছে। জেলে ছিলাম বলে বেরিয়ে এসে আরও বেশি করে বুঝতে পারছি। সব কিছুতেই আঙুলের ডিজিটাল ছাপ, থ্রি প্রিন্ট। সই-সাবুদ ভ্যানিশ। পেপার ওয়ার্ক আর নেই। আগে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ফাইল যেত, টাকা গুঁজে দিতাম। খেল খতম। এখন সব ডিজিটাল। হাঃ, হাঃ।

মিঃ খেমকা চোখ দুটো বড় বড় করে ঠোঁটের কোণে বিদ্রুপের হাসি এনে বলে উঠলেন,—তাতে কি আমার, আপনার কুনো অসুবিধে হয়েছে? টেকনোলজি টেকনোলোজির জায়গায় আছে। আমরা আমাদের পথ করে নিয়েছি। আগে অনলাইনে ওসব কামকাজ সারতে হত, এখন অফলাইন। ঠিক বলেছি কি না—! অট্টহাসি করে উঠলেন মিঃ খেমকা।

তারপরে একটু থেমে মাটির উপরে পানের পিক ফেলে পুলকের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন,—ওসব পারমিশনের বাত হামার উপর ছেড়ে দিন। দো দিনে সব ডিসপিউট মিটিয়ে ফেলব। তা ছাড়া মিঃ বাগচীও তো আপনার বন্ধুলোগ আছে। ফাইল পটাপট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। একমাসের মধ্যেই সব গ্রিন সিগন্যাল।

একটু থেমে মিঃ খেমকা বললেন,—হ্যাঁ, কিছু লোকাল প্রবলেম আছে, ঝুট-ঝামেলা করতে পারে, তা সে তো আমার থেকে আপনার ভালো মালুম আছে তাদেরকে কী করে ঠান্ডা করতে হয়।

পুলক চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে মুচকি হেসে মিঃ খেমকার মন্তব্যে সায় দিল। ও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাধা এল। ঠিক সেই সময়েই ফোনে একটা মেসেজ এসেছে। মেসেজটা দেখে খানিকক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল পুলক। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে আপনমনে বলে উঠল,—আজকে যে তোমার দিন শেষ অরিজিৎ। আর কদ্দিন পালিয়ে পালিয়ে বাঁচবে?

মেসেজ দেখে পুলকের হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করে মিঃ খেমকা বলে উঠলেন,—কোনো প্রোবলেম হল পুলকবাবু? কিছু হেল্প লাগবে?

—না, না। ঘরে অনেকদিন ধরে একটা ইঁদুর ঘোরাঘুরি করছিল। ট্র্যাপ বসিয়েছিলাম। মাউসট্র্যাপ। ধরা পড়েছে।

—সে তো আচ্ছা বাত আছে। এইসব ইঁদুর ভারী উৎপাত করে। সোব ক্লিন করে দিন। হাঃ হাঃ হাঃ। হামিও তো আপনার সঙ্গে আছি, না কি?

ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে পুলক বলে উঠল,—এক্সকিউজ মি ফর এ মিনিট।

দ্রুত পায়ে পার্টির ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে মেসেজটাতে আরেকবার মন দিয়ে চোখ বোলাল পুলক। অরিজিৎ-এর অ্যাড্রেসটা পাওয়া গেছে। অনেক অনেক দিন খোঁজাখুঁজির পর। এসেছে অত্যন্ত বিশ্বস্ত সোর্স থেকে। একমুহূর্ত দেরি করা চলবে না। খুব তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। এই একটা লোকের জেদের জন্য পাঁচ বছর জেলের ঘানি টানতে হয়েছে। তা না হলে, কী ছিল না পুলকের সঙ্গে? সব রকমের পলিটিক্যাল সাপোর্ট, দেশের সবথেকে নামকরা ল-ইয়ার, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, টাকা, পুলিশ—যা যা দরকার সবই ছিল। শুধু একটা অত্যন্ত সাধারণ লোকের জন্য জেলের মধ্যে এতদিন কাটাতে হল পুলককে। ডেমোক্র্যাসি! চুরুটটা ছুড়ে বাগানে ফেলে বাড়ির পিছনের গেটের দিকে এগিয়ে গেল পুলক।

বিশ্বস্ত অনুচর হাবুলকে একবার ডেকে নিল পুলক। জানিয়ে দিল সে দরকারি কাজে বেরোচ্ছে এক ঘণ্টার জন্য। কাউকে জানানোর দরকার নেই।

পার্টিতে স্বাভাবিক সেন্সে আছে এমন লোকের সংখ্যা এখন কম। কেউ লক্ষ করার আগেই কাজ সেরে ফিরে আসা যাবে। কারণ, অরিজিৎ আবার যদি চোখে ধুলো দিয়ে পালায় তো ধরা মুশকিল হবে।

ড্রাইভার গণেশ গাড়ির সিটে বসেই ছিল। পিছনের সিটে উঠতে গিয়ে হঠাৎ পুলকের মনে হল গণেশকে সঙ্গে নেওয়াটা কি নেহাতই দরকার? এসব ঘটনার যত কম সাক্ষ্যপ্রমাণ রাখা যায় ততই ভালো। কখন কার কী মতিগতি হয় তা কি বলা যায়! সঙ্গে যে ধাতব বস্তুটা আছে, সেটাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

আর তাছাড়া এই নতুন গাড়িটাতে ড্রাইভারের দরকারই বা কী? সকালবেলা কোম্পানির লোকেরা ডেমনস্ট্রেশনও দিয়ে গেছে। এর থেকে পারফেক্ট টাইমিং আর হতে পারে না। সত্যি, পাঁচ বছরে কত কিছুই পালটে যায়। জেলের ভেতরে বসে সব রকমের খবর পেলেও এটা পুলকের জানা ছিল না যে একদম ড্রাইভারহীন গাড়ি এসে গেছে কলকাতায়। অবশ্যই সাধারণের আয়ত্তের বাইরে। গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট করে শুধু গন্তব্যস্থানের অ্যাড্রেস দিলেই হল। গাড়ি ছুটে চলবে রাস্তার স্পিড লিমিট মিলিয়ে, অন্য গাড়ির সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রেখে।

ভাবা যায়! গাড়ি চালানোরই দরকার নেই। হঠাৎ করে সামনের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লেও গাড়ি ঠিক অ্যাক্সিডেন্ট বাঁচিয়ে জায়গা করে নেবে। যে লোকটা গাড়ি দেখাতে এসেছিল তাকে নিয়ে পুলক তিনবার নিজে গাড়ি চালিয়েছে। চালিয়েছে মানে চালকের আসনে বসেছে—এই আর কী! কারণ সত্যিই তো কোনো কাজ নেই। অ্যাড্রেস দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকো। গাড়ি ঠিক নির্দিষ্ট অ্যাড্রেসে গিয়ে

তবে দাঁড়বে। পুরো রাস্তা খুঁজে নেবে স্যাটেলাইট দেখে। কোনো রাস্তায় অসুবিধে, যানজট, থাকলে অন্য পথ বেছে নেবে।

পুলক নানান লোককে চেনে, নানান জায়গায় যায়। গণেশ ড্রাইভার হিসেবে যতই বিশ্বাসী হোক না কেন—ওরও তো চোখ আছে, কান আছে। বলতে গেলে পুলকের যাবতীয় কৃতকর্মের সব থেকে বড় যদি কোনো সাক্ষী থেকে থাকে, সে হল গণেশ। এখন সে আপদকেও বিদেয় করা যাবে। মনটা ভারী খুশি হয়ে উঠল পুলকের।

গণেশকে গাড়ি থেকে নামতে বলে ড্রাইভার-সিটে বসে সামনের মনিটরে সদ্য পাওয়া অ্যাড্রেসটা দিল পুলক। তারপর ইঞ্জিন স্টার্ট করতে গাড়ি নিজে থেকেই আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সিগন্যাল দিয়ে মাঝের লেন ধরল। পনেরো মিনিটের পথ। কলকাতায় থাকার মতো এত বড় বোকামিটা অরিজিৎ যে করবে তা ভাবতে পারেনি পুলক। ওর কি বোঝা উচিত ছিল না যে পুলকের প্রথম টার্গেটই হবে ও?

আট বছর আগেকার কথা। রঘুগ্রামে একটা অনাথ-আশ্রম চালাত একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। 'স্বপ্ন' ছিল সংস্থার নাম। অরিজিৎ ছিল ওই সংস্থার কর্মাধ্যক্ষ। সংস্থার জমিটা নিয়েই গণ্ডগোল। গঙ্গার ধারের ওই জমিটাই দরকার ছিল পুলকের। অবশ্য ওটা ছিল পুরো প্লটটার একটা ছোট অংশ। ভারী সুন্দর জায়গা। ঘুম থেকে উঠে চোখ খুললেই সামনে গঙ্গা। বিজ্ঞাপনের ট্যাগলাইনটা এখনও মনে আছে—'গঙ্গাতীরে জমিদারি'।

সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। গণ্ডগোল বাঁধল ওই দশ একর জমিটা নিয়ে। কিছুতেই জায়গাটা ছাড়বে না—বহু পুরোনো অনাথ-আশ্রম নাকি! তাতে কী হয়েছে? অনাথ-আশ্রম গঙ্গার ধারে থাকার কী এমন দরকার? আরে বাবা, অনাথদের আছেটাই বা কী! আর পাশের বৃদ্ধাশ্রমটা? ওটারই বা কী দরকার?

তা যাই হোক, অরিজিৎ লোকটার সেই লজিক্যাল সেন্সটাই নেই। টাকার লোভটাও নেই। তাই বাঁকা আঙুলে ঘি তুলতে বাধ্য হল পুলক। অনাথ-আশ্রমে আগুন লাগিয়ে দিতে হল। বৃদ্ধাশ্রমে অবশ্য সেটাও করতে হয়নি। বুড়োবুড়িগুলোর বাক্স-প্যাঁটরা ঘরের বাইরে ছুড়ে ফেলতেই—ব্যস!

লোকাল থানার ওসি মঞ্জুর হোসেন পুলকের দলেই ছিল। তাই কোনো অসুবিধেই হয়নি। পুরো ঘটনাটা অন্যভাবে সাজানো হল।

বাদ সাধল ওই লোকটা—অরিজিৎ। আর তারই জন্য অবশেষে পুলকের মতো একজনকেও জেলে যেতে হল। ভাবা যায়!

ঘুমই এসে যাচ্ছিল পুলকের। গাড়ি নিখুঁতভাবে অন্য গাড়ির পাশ কাটিয়ে ছুটে চলেছে। কিছুই করার নেই। অনেক রাত হয়েছে। তাই এমনিতেও রাস্তায় গাড়ি খুব কম। রাস্তার দুধারে আলোগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে। দোকানপত্তর সব বন্ধ।

আচ্ছা, গাড়িটাকে ইচ্ছেমতো থামানো যায় তো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যায়। লোকটা তো বেশ কয়েকবার দেখিয়েছিল। হ্যাঁ, ড্যাশবোর্ডের ওই কালো নবটা ঘোরালেই অটোম্যাটিক থেকে ম্যানুয়াল কন্ট্রোল, অর্থাৎ নিজের অধিকারে গাড়িকে নিয়ে আসা যাবে। তারপরে ওই লাল বাটনটা প্রেস করলেই গাড়ি সবথেকে কাছাকাছি নিরাপদ জায়গা খুঁজে দাঁড়িয়ে যাবে।

সত্যি, টেকনোলজি কোথায় এগিয়েছে! তাও আবার কলকাতার বুকে! পরে একদিন ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে আবার এ গাড়ি চড়তে হবে। হাতে গোনা তিন-চারজন মাত্র আছে কলকাতার বুকে যারা এরকম গাড়িতে চড়তে পেরেছে। গাড়ি দিতে এসে লোকটা তা-ই বলছিল। দেখার মতো উজ্জ্বল চোখ লোকটার। ও নাকি ওই কোম্পানির সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার। সাদা শার্ট, লাল টাই পরে এসেছিল। আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা গাড়ির সেলসম্যান হয়ে গেছে।

হেসে বলছিল লোকটা,—গাড়িটা চড়ে দেখবেন পুলকবাবু, কেন এত দাম! ভাঙাচোরা যেকোনো রাস্তাই হোক না কেন, কোথাও কোনো জার্কিং নেই। আর কমপ্লিট সেফটি। নিশ্চিন্তে কফি খেতে খেতে যেতে পারবেন গাড়িতে। সত্যিই তাই। লেন চেঞ্জ করে কী সুন্দর খেলনা গাড়ির মতো এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা! গাড়ির গতিরও হঠাৎ করে কমা-বাড়া নেই। নিখুঁতভাবে চালালে যেরকম হয় আর কী! নিঃশব্দ গাড়ির কাঁচের বাইরের কলকাতাটা এখনও যদিও অতীতেই পড়ে আছে।

হঠাৎ পুলকের মোবাইলটা বেজে উঠল। অচেনা নাম্বার থেকে কেউ ফোন করছে। পুলকের ফোনের এ নাম্বার খুব কম লোকের কাছেই আছে। ফোনটা রিসিভ করে পুলক ভারী গলায় 'হ্যালো' বলে উঠল।

—গাড়ি কেমন লাগছে স্যার?

—কে বলছ?

—স্যার, আমিই তো আপনাকে আজকে গাড়িটা ডেলিভারি দিলাম।

—ও বরুণ? খুব ভালো। কিন্তু তুমি কী করে জানলে যে আমি গাড়িতে আছি।

—তা আমি জানব না? আমিই তো আপনাকে অ্যাড্রেসটা পাঠালাম।

—মানে? একটু অবাক হয়ে পুলক ফের বলে উঠল,—কিন্তু যে নাম্বারটা থেকে মেসেজটা এসেছিল সেটা তো আমার চ্যালা বিন্টুর নাম্বার। তুমি ওই ফোন থেকে মেসেজটা পাঠালে কী করে?

—আসলে ফোনটা আর বিন্টু—দুজনেই এখন আমার কাছে। হেসে ওঠে উলটোদিকের লোকটা।

—মানে? তুমি কে? অরিজিতের অ্যাড্রেস জানলে কী করে?

—বাহ্, আমার অ্যাড্রেস আমি জানব না? আমিই অরিজিৎ।

একটা অশ্রাব্য গালাগাল করে চেঁচিয়ে উঠল পুলক। কন্ট্রোল নেওয়ার জন্য কালো নবটা ঘুরিয়ে গাড়ি থামানোর লাল বাটনটা প্রেস করল পুলক। অবিলম্বে গাড়ি থামানো দরকার। কোনো ট্র্যাপে ফেলছে না তো?

কিন্তু গাড়ির স্পিড একবিন্দু কমল না। পাগলের মতো বারবার বাটনটা প্রেস করতে থাকল পুলক। অটোম্যাটিক থেকে ম্যানুয়াল মোডে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকল, যাতে গাড়িটা নিজের নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু গাড়ি একইভাবে চলতে থাকল, একই স্পিডে।

—অরিজিৎ, তোমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব। আমি কে তুমি জানো না, আমার নাম পুলক। চিৎকার করে উঠল পুলক।

উলটোদিক থেকে হাসির আওয়াজ শোনা গেল।

—আমার কি হবে জানি না। তবে গঙ্গা আর গঙ্গাপ্রাপ্তি দুটোই আপনার থেকে খুব একটা দূরে নেই। আপনি কী করার চেষ্টা করছেন তা আমি জানি। কিন্তু এ গাড়ি এখন আর থামবে না। আপনি তিরিশের কমে গাড়ি চালান না বলেছিলেন না, তাই আমি সেরকমই সেটিং করে দিয়েছিলাম, যাতে একবার স্টার্ট করলে গন্তব্যস্থলে না পৌঁছোনো পর্যন্ত তিরিশের থেকে স্পিড না কমে। আর আপনিই আমার গাড়ির প্রথম কাস্টমার তো! তাই কিছু কিছু জিনিস ঠিকভাবে কাজ করছে কি না তা এখনও দেখা হয়নি।

একটু থেমে অরিজিৎ ফের বলে উঠল,—এই যেমন ব্রেক-এর কাজটা।

পুলক বিহ্বল হয়ে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল গাড়িটা একটা ব্রিজের উপর উঠছে। ব্রিজটায় ওঠার জায়গায় নানান রকম ওয়ার্নিং সাইন আর ব্লক করার ব্যবস্থা আছে। সেগুলোর মধ্যে দিয়েই নিখুঁতভাবে পাশ কাটিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। এই ব্রিজটা পুলকের তৈরি। বাজে কনস্ট্রাকশন মেটিরিয়াল দেওয়ার জন্য একবছর আগে ভেঙে পড়েছে। এখন আবার কাজ শুরু হয়েছে।

—আরে, এ কী! সামনে পথ কোথায়! চিৎকার করে উঠল পুলক। কিছুটা দূরে ব্রিজের পথটা শেষ হয়ে গেছে কাজ চলার দরুন।

—আহা, চিৎকার করছেন কেন? ওই অ্যাড্রেসটা তো গঙ্গার ঠিক মাঝামাঝিরই অ্যাড্রেস। দেখেছেন, আরেকটা ভুল করেছি। গাড়ির জিপি-এসটা শুধু শর্টেস্ট ডিসট্যান্সটাই দেখে, তাই না! রাস্তা আছে কি না, সে রাস্তায় কাজ হচ্ছে কি না, বা রাস্তা হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে কি না—তা আর চেক করে না। চুক চুক করে আওয়াজ করে উঠল অরিজিৎ।—বড় ভুল হয়ে গেছে দেখছি।

পাগলের মতো গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করল পুলক। দরজা খুলল না। ড্যাশবোর্ডের সব সুইচগুলো একটার পর একটা টিপে গেল পুলক। কোনোক্রমে যদি—নাহ্—গাড়ির স্পিড কমার কোনো লক্ষণ নেই।

ফের চিৎকার করে উঠতে গেল পুলক। কিন্তু গাড়িটা ততক্ষণে নির্মীয়মাণ ব্রিজের শেষ প্রান্ত থেকে ক্যারামের গুটির মতো ছিটকে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর নামতে শুরু করেছে নীচের দিকে। প্রায় দুশো ফুট নীচের গঙ্গার দিকে।

দীপান্বিতা রায়

মিকিমোটো নেকলেস

ছবি নীলমণি রায়

১৪ নভেম্বর, চিলড্রেন্স ডে-র দিন হোটেল মেরিনাতে চুরি যায় প্রীতি টুন্ডার বহুমূল্য মুক্তো ও হিরে খচিত নেকলেস। এদিকে প্রাইভেট ব্যাঙ্কের কর্মচারী নিলয় সরকারকে যেন কারা ফলো করছে। ওই দিন তিনি স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে ডিনার করতে গেছিলেন হোটেল মেরিনাতেই।

দিগন্তর অনুমানই সঠিক হল। ঠিক তিনদিনের মাথায় বিকেল চারটে নাগাদ ফোন এল দিগন্তর মোবাইলে। ক্লাস শেষ করে দিগন্ত তখন সবে বেরোনোর উদ্যোগ নিচ্ছে। স্ক্রিনে নিলয় সরকারের নামটা দেখেই তাড়াতাড়ি ফোনটা ধরল দিগন্ত।

—দিগন্ত বলছি। বলুন।

—মিঃ দেব আপনি একবার আমার বাড়িতে আসতে পারবেন?

—কেন বলুন তো? কী ব্যাপার?

—ব্যাপারটা একটু গুরুতর। বাড়িতে চুরি হয়েছে। আজ সকালে আমরা যখন বাড়িতে ছিলাম না, তালা ভেঙে ঢুকেছে।

—পুলিশে খবর দিয়েছেন?

—না এখনও দিইনি। ভাবছি আপনার সঙ্গে আলোচনা করে দেব। একবার যদি আসতে পারেন।

নিলয় সরকারের কাছ থেকে বাড়ির ডিরেকশনটা জেনে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে দিগন্ত। অফিস টাইমের ভিড় তখনও শুরু হয়নি। তাই আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছেও যায়।

মনোহরপুকুরের এই এলাকাটা একটু ঘিঞ্জি। রাস্তার দু-পাশে ছোট-বড় ফ্ল্যাট উঠেছে। কিন্তু রাস্তাগুলো তেমন চওড়া নয়। পাশাপাশি দুটো গাড়ি গেলে মাঝখানে জায়গা নেহাতই কম থাকে। একটা ছোট আবাসনে নিলয় সরকারের ফ্ল্যাট। ছয় তলা উঁচু দুটো টাওয়ারের একেকটাতে দশটা করে বাড়ি। নিলয় সরকার থাকেন টাওয়ার বি-র পাঁচ তলায়। লিফটে করে উঠে বেল বাজাতে ভদ্রলোক নিজেই দরজা খুললেন। সেদিনের তুলনায় মুখে অনেক বেশি উৎকণ্ঠার ছাপ। সোফায় বসে দিগন্ত বলল,—চুরিটা কখন হল, কীভাবে হল, কে প্রথম জানতে পারল সবটা ডিটেলে বলুন।

—আজ সকালে আমরা বেরিয়ে যাওয়ার পরেই চুরি হয়েছে। আমরা তিনজনে একসঙ্গেই বেরিয়েছিলাম। তিনটে নাগাদ ও ফিরে আসে। দরজায় চাবি ঢোকাতে গিয়ে দেখে চাবি ঘুরছে না। তখনই ও বুঝতে পারে দরজাটা খোলা। মিতালি ন্যাচারালি খুবই ভয় পেয়ে গেছিল। ও ভেবেছিল ঘরের ভিতরে কেউ আছে। তাই কোনও রকমে মেয়েকে কোলে নিয়ে ছুটে নীচে নেমে আমাদের নীচের ফ্লোরের লোকজনকে ডেকে আনে। চেঁচামেচিতে কেয়ারটেকারও এসে পড়ে। তারপর দরজা খুলে দেখা যায় যে ভিতরে কেউ

নেই। দরজাটা একটা মোটা কাগজের টুকরো দিয়ে চেপে আটকানো ছিল।

দিগন্ত উঠে গিয়ে দরজাটা দেখে। দামি গা-তালা লাগানো। কোনও একটা সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে তালাটাকে অকেজো করে ফেলা হয়েছে। বেশ পাকা হাতের কাজ। ফিরে এসে সোফায় বসে জানতে চায়,—কী কী জিনিস চুরি হয়েছে বুঝতে পেরেছেন? পুলিশ কিন্তু তার একটা লিস্ট চাইবে।

—সেটাই সব থেকে মুশকিল হয়েছে মিঃ দেব, কী চুরি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তার মানে?

—কিছু চুরি হয়েছে বলে মনেই হচ্ছে না।

হাতের ট্রে থেকে টেবিলের ওপর চায়ের কাপগুলো নামাতে নামাতে কথাটা বললেন নিলয় সরকারের স্ত্রী মিতালি সরকার। বয়স তিরিশের ঘরে। মিষ্টি চেহারা। একটা কিমোনো ধরনের পোশাক পরা। চুলগুলো একটু টেনে পিছনে ক্লিপ দিয়ে আটকানো।

চায়ের কাপটা দিগন্তের দিকে এগিয়ে দিয়ে মিতালি বললেন,—চুরি করার মতো কিন্তু অনেক কিছুই ছিল। আলমারিতে গয়নাগাঁটি, টাকাপয়সা কিছু তো আছেই। আলমারির চাবিটাও পাশের টেবিলেই রাখা ছিল। সাধারণত নিয়েই যাই। আজ তাড়াহুড়োতে ভুলে গেছিলাম। একটা দামি আই-প্যাড ছিল বুক কেসের মাথায়। কিছুতেই হাত দেয়নি। চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলেছে বোঝা যাচ্ছে। কারণ আমি যখন ঘরে ঢুকলাম তখন চাবিটা আলমারির গায়েই ঝুলছিল। কিন্তু সব জিনিস একদম ঠিকঠাক।

—এত রিস্ক নিয়ে তালা নষ্ট করে বাড়িতে ঢুকে কিচ্ছু নিয়ে গেল না। ভুরু কুঁচকে ওঠে দিগন্তর।

—চুরি তো হয়েছে, রিনরিনে গলাটা শুনে একটু চমকে ওঠে দিগন্ত।

—আমার কন্যা মেঘা।

দিগন্ত হাত নেড়ে ডাকলে কাছে এসে দাঁড়ায়। রোগা রোগা পুতুল পুতুল দেখতে। হাতে একটা বারবি ডল।

—চুরি হয়েছে তুমি কী করে জানলে?

—জানি তো। আমার দুটো টেডি বেয়ার চুরি হয়ে গেছে।

মেয়ের কথায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে মিতালি বলেন,—এটা কিন্তু ও অনেকক্ষণ থেকেই বলছে। ওর দুটো টেডি বেয়ার নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। ওর এত অসংখ্য পুতুল তার মধ্যে কোন দুটোর কথা বলছে বুঝতে পারছি না। সে দুটো আজকে থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না, নাকি আগে কোথাও ফেলেটেলে এসেছে তাও জানি না। ও মাঝে মাঝেই পুতুল ব্যাগে ভরে নিয়ে স্কুলে চলে যায়। সেখানেও ফেলে আসতে পারে।

—না আমি স্কুলে নিয়ে যাইনি। আমি কাল রাতেও টেডি বেয়ার নিয়ে খেলেছি। ও দুটোই আজ চুরি হয়ে গেছে...

মেঘার ঠোঁট ফুলছে দেখে দিগন্ত তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,—আমাকে একটু ভালো করে বলো তো তোমার টেডিদুটো ঠিক কীরকম দেখতে ছিল?

—একটা স্কাই ব্লু রঙের। গলায় রিবন দিয়ে বো বাঁধা। ওটা আমার খুব বন্ধু। আর একটা ইয়েলো। খুব মিষ্টি। আমার সঙ্গে খেলত। ওদের জন্য খুব মন কেমন করছে।

—টেডিদুটো তোমায় কে দিয়েছিল?

—আমি বার্থ ডে-তে গিফ্‌ট পেয়েছিলাম।

—তোমার বার্থ ডে কবে?

—আমার বার্থ ডে তো দোলের দিন। সেজন্য তো ঠামি আমায় ফাগুন বলে ডাকে...জানো কাকু আমার সব টেডি বেয়ারগুলোই কেউ না নিয়ে নিচ্ছে...

—ঠিক আছে মেঘা, তুমি এখন নিজের ঘরে গিয়ে খেলা করো।

মায়ের কথায় একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেও চলে যায় মেঘা।

—তার মানে মেঘার কথা যদি মেনে নিই তাহলে ওই দুটো টেডি বেয়ার ছাড়া আর কিছু চুরি হয়েছে বলে আপনাদের মনে হচ্ছে না?

ঘাড় নেড়ে নিলয় সরকার বলেন, সেজন্যই তো আপনার সঙ্গে কথা না বলে আমি পুলিশে খবর দিতে চাইনি।

—আচ্ছা আপনাদের বাড়ির নীচে তো কেয়ারটেকার আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন? কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেছে?

—আমাদের কেয়ারটেকার দুপুরবেলা নাগাদ ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে যায়। সেই সময় আধঘণ্টা মতো আনম্যানডই থাকে। যে কেউ কয়েকদিন লক্ষ্য করলেই সেটা বুঝতে পারবে। আমার ধারণা ওই সময়ই ঘটনাটা ঘটেছে। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে মিঃ আর মিসেস মজুমদার থাকেন। দুজনেরই সত্তরের ওপর বয়স। ঘর থেকে বিশেষ বেরোন-টেরোন না। ফলে ফ্লোরটা মোটামুটি ফাঁকাই থাকে। দরজা খুলে ঢুকলে সহজে কেউ টের পাবে না।

—আচ্ছা, গত একমাসে, মানে যবে থেকে আপনার অস্বস্তিটা শুরু হয়েছে, তার আগে বা পরে আপনারা কোথাও গেছিলেন, কোথায় বেড়াতে বা কোনও আত্মীয়ের বাড়ি...

—আমি গত শনিবার বাপের বাড়ি গেছিলাম শ্যামবাজারে। সকালে মেয়েকে নিয়ে মেট্রোতে চলে গেছিলাম। অফিস ফেরতা ও নিয়ে এল। এ ছাড়া তো...

নিলয় সরকার একটু ভেবে বলেন, না এর মধ্যে আর কোথাও গেছি বলে তো মনে পড়ছে না। ও হ্যাঁ চিলড্রেনস ডে-র দিন আমরা তিনজনে মেরিনা হোটেলে খেতে গিয়েছিলাম। ওদের ক্যান্ডেল লাইট বলে যে রেস্তোরাঁটা আছে সেখানে। মেঘার পছন্দমতো খাবার খাওয়া হবে বলেই যাওয়া হয়েছিল। সেদিন বাচ্চাদের জন্য একটা ম্যাজিক শো ছিল...

নিলয় সরকারের কথায় বাধা দিয়ে দিগন্ত বলে ওঠে, চিলড্রেনস ডে মানে তো ১৪ নভেম্বর। সেদিনই তো মেরিনা হোটলে ওই ঘটনাটা ঘটে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই নেলকেস চুরি তো। আমরা অবশ্য বিশেষ কিছুই বুঝিনি। শুধু বেরোনোর সময় আমাদের দুজনকে অনেকক্ষণ ধরে চেক করল দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম। পরের দিন কাগজ পড়ে তো দেখি এই কাণ্ড...

দিগন্তর চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে, সেদিনও কি গাড়ি আপনি নিজে ড্রাইভ করে গেছিলেন?

—হ্যাঁ।

যখন রেস্তোরাঁয় খেতে গেলেন তখন গাড়ি কোথায় ছিল?

—পার্কিং লটেই ছিল। হোটেলের লোকেরাই নিয়ে চলে গেল। আবার আমাদের ফেরার সময় বার করে নিয়ে এল। মানে যেরকম সিস্টেম আর কী।

—এমনিতে আপনি গাড়ি কোথায় রাখেন মিঃ সরকার?

—আমাদের বাড়ির নীচে পার্কিং স্পেস আছে।

—আর অফিসে?

—অফিসেও আলাদা পার্কিং লট আছে।

—আমি বেরোনোর সময় একবার গাড়িটা দেখব। আর হ্যাঁ কেয়ারটেকারের সঙ্গেও একবার কথা বলতে হবে।

—বেশ তো চলুন না।

নীচে নেমে নিলয় সরকারের গাড়ির ভিতরটা খুব ভালো করে দেখে দিগন্ত। সিটের তলা, ডিকি, সামনের সিটের পিছনে কাগজ রাখার জায়গা, ড্যাশবোর্ড, তার নীচের বক্স। দিগন্তকে ওভাবে উলটেপালটে সব দেখতে দেখে নিলয় একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞাসা করেন,—মিঃ দেব আপনি কি গাড়ির ভিতরে কিছু থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছেন?

—সেরকম একটা সম্ভাবনা মনে হয়েছিল, তবে মনে হচ্ছে সেটা সঠিক নয়। আচ্ছা, আপনারা সেদিন মেরিনা হোটেল থেকে সরাসরি বাড়ি এসেছিলেন?

—না, কসবায় আমার বোনের বাড়ি গেছিলাম। বোনের ছেলেটার ক'দিন ধরে জ্বর হয়েছিল। তাই আমার স্ত্রী একবার দেখে আসতে চাইছিলেন।

—কতক্ষণ ছিলেন সেখানে?

—খুব বেশি হলে এক ঘণ্টা। রাত হয়ে গেছিল, মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ছিল, তাই আর দেরি করিনি।

—সেখান থেকে সোজা বাড়িতেই এলেন?

—হ্যাঁ। আর কোথাও নামিনি।

চৌকিদারের সঙ্গেও বেশ খানিকক্ষণ কথা বলল দিগন্ত। কিন্তু চুরির ব্যাপারে কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। শুধু জানা গেল তিন তলায় দাশগুপ্তদের বাড়িতে ঠিকে কাজ করে যে বউটি, সে ওই সময় লিফট্ থেকে একটা অচেনা লোককে নামতে দেখেছিল। তার হাতে একটা বড় কাপড়ের ব্যাগ ছিল।

(ক্রমশ)

প্রদীপকুমার বিশ্বাস

নিশিরাতে প্লুটোর প্রভু

রহস্য গল্প প্রতিযোগিতায়
সান্ত্বনা পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প

ছবি জুরান নাথ

সিটি গ্রুপের পাঁচ কোটি টাকার শপিং মলের ডিজাইন তৈরির কাজ শুরু করবার চিঠি এবং তার সঙ্গে অগ্রিম বাবদ মোটা টাকার চেক পাবার আনন্দে, অন্য দিনের মতো আমি সামনের গেট দিয়ে না গিয়ে, পেছনের গেট দিয়ে গাড়ি বার করে লাল মোরামের শর্টকাট রাস্তাটা ধরলাম। সেই সামান্য ভুল যে আমাকে কানা গলিতে পেতে রাখা মাকড়সার জালে জড়িয়ে ফেলবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

প্রধান নিকাশি নালার ওপর একটা সংকীর্ণ সেতুকে চওড়া করবার সরকারি অনুমোদনের জটে আটকে গিয়ে এই বাইপাস এখন কাঁচা রাস্তা হয়েই থমকে আছে অনেকদিন ধরে। রাস্তাটা সরু আর কাঁচা বলে গাড়ির ভিড়ও অনেক কম।

একটা ঝাঁ-চকচকে নতুন মডেলের ভি-ডব্লিউ খুব বিশ্রীভাবে কেউ পার্ক করেছে ঠিক সেতুটার মুখের কাছে। শুধু তাই নয়, গাড়িতেও কেউ নেই বলেই মনে হয়। একে পাশ কাটিয়ে যাওয়া বেশ মুশকিল।

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, বেশ অন্ধকার এখন বাইরে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডাইনে-বাঁয়ে কতটা কাটাতে হবে সেটা বোঝার জন্য গাড়ি থেকে বেরোতে হল।

টিপ টিপ বৃষ্টির হাত থেকে মাথা বাঁচাতে আমার প্রিয় স্কাইপ্‌ড গল্‌ফ ক্যাপ আর চার ব্যাটারির ফ্ল্যাশ লাইটটা সঙ্গে রাখলাম।

ভি-ডব্লিউটাকে কাটাবার রাস্তা দেখার জন্য ব্রিজের রেলিং-এর ধারে আলো ফেলতেই সেতুর ওপরই একটু দূরে একপাটি দামি কোলাপুরি চপ্পল আর একটা নামি ব্র্যান্ডের ব্রিফকেসের হাতল নজরে এল।

কিন্তু এই নির্জন সেতুতে পর পর এই দুটো জিনিস!

গাড়ি মালিকের একবার ব্যর্থ অনুসন্ধান সেরে নিজের গাড়ির কাছে এসে দরজা খুলতে যাচ্ছি, এমন সময় মনে হল আমার কানের কাছে কেউ যেন একবার জোরে হাততালি দিল।

খেলোয়াড় হবার সুবাদে আমার প্রতিক্রিয়া সাধারণের থেকে বেশি। কিন্তু আমি বিদ্যুৎগতিতে ঘাড় ঘোরাবার আগেই একটা মোক্ষম রদ্দা পড়ল আমার

মেরুদণ্ডে, আর সেইসঙ্গে কেউ কিছু একটা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আমার হাঁটুতে মারল।

মাটিতে গড়িয়ে যাবার আগে মনে হল আমার শার্টটা রক্তে ভিজে যাচ্ছে। একটা তীব্র যন্ত্রণা আমার মেরুদণ্ড থেকে পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। দু-চোখে যেন আঁধার নেমে এল।

জ্ঞান ফিরতে বুঝলাম আমি নিজের বোলেরোর সামনের সিটে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছি। অনেক চেষ্টার পর হাতড়ে হাতড়ে ড্যাশবোর্ড থেকে পেইন রিলিফের বটলটা নিয়ে কোনও রকমে যতটা সম্ভব মেরুদণ্ডের কাছে স্প্রে করলাম।

ওষুধটা কিন্তু দারুণ কাজ করল। আমি এখন গাড়ি চালাতে পারব মনে হল। এই ভয়ঙ্কর জায়গাটা থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।

ইঞ্জিন চালু করার সময় দেখি গুণ্ডারা গাড়িটা সেতু পার করে অন্য প্রান্তে রেখেছে। আমার মোবাইল, দামি ঘড়ি, হিরের আংটি কিছুই নেয়নি। শুধু গলফ ক্যাপটা উধাও।

হাইওয়ের মোড়ে আসতেই সিগনাল লাল হয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে পুরো ঘটনাটা চকিতে ভেসে উঠল মনের পর্দায়।

কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। যদি আমি রোজ এই নির্জন লাল মোরামের রাস্তা দিয়েই যাওয়া-আসা করতাম, তাহলে এটা সম্ভব যে কেউ আমাকে মারবার জন্য আগে থেকেই সেখানে গুণ্ডা ভাড়া করে রেখেছে। কিন্তু আমি তো কচিৎ-কদাচিৎ এই পথ ধরি।

তাহলে কি পরিত্যক্ত ভি ডব্লিউটা, এক পাটি দামি কোলাপুরি চপ্পল, দামি ব্রিফকেসের হাতল অন্য কিছুর ইঙ্গিত করছে?

কাছে কোথায় যেন কুকুরের কুই কুই শুনলাম। আওয়াজটা আর একবার কানে আসতেই মাথা একটু পেছন দিকে ঘুরিয়ে চোখ নামিয়ে দেখি দিব্যি সুন্দর দেখতে রেশমি কালো রঙের এক স্পানিয়েল গাড়ির পেছনের সিটের তলায় কুঁকড়ে বসে আছে।

আমি সাহস করে একটা হালকা হুইসিল দিলাম, কুকুরটা লাফ দিয়ে আমার পাশে এসে বসতেই সিগনাল হলুদ হল। রাস্তায় যেতে যেতে মাঝে মাঝে কুকুরটাকে দেখছিলাম।

ওর গলার দামি বেল্ট আর পিঠের দামি সিল্কের কভার বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এর মালিক কোনও রইস আদমি। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না এই কুকুর কীভাবে এল আমার গাড়িতে।

কী মনে হল, দুম করে ওর একটা নাম দিয়ে বসলাম—প্লুটো। কিন্তু নামটা ওর খুব একটা পছন্দ হল না। প্লুটো বলে ডাকতেই দেখি 'গর...গর' করে উঠল।

গাড়ি আবাসনের গ্যারাজে রেখে প্লুটোকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। কোথা থেকে যেন পারফিউমের গন্ধ আসছে। একটু এদিক-ওদিক ঘাড় ঘোরাচ্ছি। হঠাৎ প্লুটো দৌড় লাগাল গ্যারাজের দিকে। আমাকে ছুটতে দেখে সিকিউরিটির লোকটিও দৌড়ে এল।

ততক্ষণে প্লুটো আমার গাড়ির পিছনের দরজা আঁচড়াচ্ছে। ওদিকের দরজা খুলে দিতেই ও লাফিয়ে মুহূর্তের মধ্যে একটা কোলাপুরি চপ্পল মুখে কামড়ে বেরিয়ে এসেই আমার আগে আগে চলতে থাকল।

ফ্ল্যাটে ঢুকেই প্লুটো সব ঘরগুলো ঘুরে নিয়ে লিভিং রুমে সোফা আর ডিভানের মাঝে দেওয়ালের কোণটা পছন্দ করল। একটা কম্বলের টুকরো ডিভানের তলায় রাখা ছিল, পা দিয়ে সেটা টেনে তার ওপর জমিয়ে বসল।

একটা প্লেটে বিস্কুট আর বড় কাপে জল ওর সামনে নিয়ে রাখতেই সেই মিষ্টি গন্ধটা আবার টের পেলাম। এটা তো মনে হয় হাসপাতালে অজ্ঞান করবার জন্য দেয়।

প্লুটোর মুখের কাছে আরেকটু ঝুঁকতেই একটা কালসিটে পড়ার মতো দাগ দেখলাম।

আমি এবার নিশ্চিত হলাম আমার গাড়িতে ফেলার আগে একে মারধর করা তো হয়েছেই, এমনকী গুণ্ডারা শেষতক একে অজ্ঞানও করেছে। ইথারের গন্ধটা এখনও সামান্য হলেও রয়ে গেছে।

ফ্রিজ থেকে মশলা মাখানো চিকেন বার করে এয়ার ফ্রায়ারে মুচমুচে ভেজে একটা প্লেটে নিয়ে এলাম।

কী ভেবে, এক টুকরো চিকেন প্লুটোকে এগিয়ে দিতেই ও বিরক্ত হয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠে দাঁড়াল আর তার কারণটাও আমার বুঝতে দেরি হল না।

যে কম্বলটা ও নিজেই জোগাড় করে সোফা আর ডিভানের দেওয়ালের কোণে শুয়েছিল, সেই কম্বলের তলাতেই ও একপাটি কোলাপুরি চপ্পল রেখেছে। আমার বুঝতে বাকি থাকল না যে ওই একপাটি চপ্পল ওর প্রভুর। আমি মাংসের টুকরোর লোভ দেখিয়ে সেই চপ্পলটা হাতাবার ফন্দি করছি এই সন্দেহে ও এত বিরক্ত হয়েছে।

আর বেশি কিছু না ভেবে সোজা ডিভানের ওপর শুয়ে রিমোটের বাটন টিপে টিভি চালু করে বোতল থেকে কোল্ড ড্রিঙ্ক গ্লাসে ঢাললাম। এই সময় এম টিভি-তে একটা দুম-ফটাস নাচ-গানের প্রোগ্রাম দেখায়। সেই চ্যানেলে যাবার জন্য রিমোটে হাত দেবার আগেই সকালে টিভি যেখানে বন্ধ করেছিলাম, সেই চ্যানেল চালু হয়ে গেল।

এটা নিউজ চ্যানেল, কিন্তু এখানেরই নাম দিয়ে কোনও একটা ঘটনা বোধ হয় দেখাচ্ছে। আরে! এটা তো শাসক দলের স্থানীয় নেতা মনু সিং-এর বাড়ি, বলছে ওকে অপহরণ করা হয়েছে।

মনু সিং নেতা হলেও আসলে উনি অপরাধ জগৎ থেকে ক্ষমতার অলিন্দে উঠে আসা এক ধুরন্ধর ব্যক্তি। তিন-চার জন স্বাস্থ্যবান সিকিওরিটি সর্বক্ষণ ওর সঙ্গে থাকে।

এরকম একজন ভি আই পি ব্যক্তির অপহরণের খবর ব্রেকিং নিউজ তো বটেই।

বিজ্ঞাপন চালু হল। আমিও রিমোটের বাটন টিপে লোকাল নিউজ চ্যানেলটা কোথায় আছে, সেটা খুঁজতে আরম্ভ করলাম।

মনু সিং এমনিতে আমার কাছে একটা তেতো নাম। বেশ কয়েক মাস আগে ওর একটা শপিং মলের পুরো ডিজাইন আর সামনের কিছু অংশ বানাবার কাজ বাবদ বেশ মোটা টাকা বকেয়া পাওনা হয়ে আছে। অনেকবার তাগাদা করার পর শেষমেশ হাল ছেড়েছি।

লোকাল নিউজ চ্যানেলটা টিভি-র পর্দায় ভেসে উঠতেই আমর বুকের রক্ত চলকে উঠল।

প্রথমে দেখাল মনু সিংয়ের নতুন ঝাঁ-চকচকে ভি-ডব্লিউ গাড়ি। এই গাড়িটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখা গেছে সেই নির্জন সেতুটার ধারে। পুলিশ এখন এইটুকু জানিয়েছে যে মনু সিং তার মোবাইলে পর পর দুটি কল পেয়ে বাড়িতে কিছু না জানিয়ে তার নতুন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। সে সময় কোনও লোকজন তার সঙ্গে ছিলনা।

মিডিয়ার লোকজন পুলিশের চেয়ে অনেক বেশি চটপটে। তারা এর মধ্যে দুজন লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছে যারা আজ বিকেল থেকে সন্ধের বেশ কিছু পর ওই রাস্তাটা দিয়ে পার হয়েছে। এই ক্লিপিংটা আমাকে বেশ ভয় পাইয়ে দিল।

এদের মধ্যে একজন সেতু থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে থাকা নীল বোলেরো থেকে একটা কালো স্পানিয়েলকে মুখ বাড়িয়ে আর্ত চিৎকার করতে দেখেছে। সে তার গাড়ি থামিয়ে ব্যাপারটা কী বোঝবার জন্য দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বোলেরোতে কেউ নেই দেখে চলে আসে।

অন্যজন বলছে যে, সে উলটো দিক দিয়ে তার গাড়িতে আসছিল। এই নীল রঙের বোলেরোটির জন্য তাকে খুব ধীর গতিতে পাশ কাটাতে হয়। সে খুব ভালোভাবে দেখেছে গাড়ির মালিককে বোলেরোর বনেটের কাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

সে লক্ষ করেছে এই লোকটি বেশ স্বাস্থ্যবান, লম্বা, শ্যাম বর্ণের, তার পরনে কালো রঙের ট্রাউজার, দামি ফুলহাতা সাদা শার্ট আর মাথায় স্কাইপড গল্‌ফ ক্যাপ।

টিভির নিউজ অ্যাংকর বললেন, 'ব্রিজের মাঝখানে পাওয়া একপাটি কোলাপুরি চটি, একটা ব্রিফকেসের ভাঙা হাতল, স্কাইপড গল্‌ফ ক্যাপ এবং ব্রিজের তলায় কিছু পায়ের ছাপ এবং একটা ভাঙা ব্রিফকেস পাওয়া গেছে। এসব থেকে অপরাধীদের হদিস পাবার জন্য পুলিশ-কুকুর খুব শীঘ্রই এসে পৌঁছোবে।'

একজন অপরাধবিশেষজ্ঞ সংবাদ উপস্থাপিকাকে বললেন, 'এটি খুব সম্ভবত অপহরণের ঘটনা। পুলিশ প্রাথমিক ভাবে সেটা না মানলেও যার-যার সঙ্গে মনু সিংয়ের ব্যবসায়িক লেনদেন হয় বা হত, তাদের আগের এবং বর্তমান

গতিবিধির ওপর নজরদারি চালানো দরকার। তবে মনে হচ্ছে এখনো অবধি মুক্তিপণ চেয়ে কোনও ফোন আসেনি।

এসব শুনে আমার আর টিভি দেখবার ইচ্ছে হল না। টিভি-তে যা দেখানো হল তাতে পুলিশ চাইলে আমাকে নিয়ে ভালোরকম টানা-হেঁচড়া করতে পারে।

তার কারণ, একে তো মনু সিং আমার কাছে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বাকি রেখেছে। উপরন্তু কেবল মাত্র ঘটনার দিনই আমি আমার রোজকার ফেরবার রাস্তা বদলে ওই কাঁচা রাস্তা ধরে আমার নীল বোলেরোতে ঘটনাস্থল দিয়ে ফিরেছি এবং তাও ঠিক অপহরণের সম্ভাব্য সময়ে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী নীল বোলেরোর বনেটের সামনে দাঁড়ানো গাড়ির মালিকের চেহারার সঙ্গে আমার চেহারাও অনেকটা মিলে যাচ্ছে। এমনকী সেই ব্যক্তিও স্কাইপ্ড গল্‌ফ ক্যাপ পরেছিল যেটা আমি বাইরে বেরোলেই পরি।

মোটের ওপর অপহরণের ষড়যন্ত্রে যুক্ত সন্দেহভাজনদের তালিকায় আমার স্থান বেশ ওপরের দিকে এবং এখন থেকে যে কোনও সময় পুলিশ আমাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ এবং সন্দেহবশত গ্রেফতার করতেই পারে।

একমাত্র মুক্তিপণ চেয়ে কোনও গোপন ডেরা থেকে ফোন এসে গেলেই বোঝা যাবে যে আমি নই, আসল অপরাধী অন্য কেউ।

টিভি বন্ধ করে, সব ক'টা আলো নিভিয়ে বেড রুমে এসে একটু চোখ বন্ধ করবার চেষ্টা করতে যাব এমন সময়ে বেশ কতগুলো অসঙ্গতি মনে এল।

খবরে দেখিয়েছে, মনু সিং একটা ফোন কল পায় এবং তড়িঘড়ি তার নতুন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে প্রায় নির্জন এই লাল মোরামের রাস্তার দিকে। মনু অনেকরকম ব্যাবসার আড়ালে যে স্মাগলিং, ড্রাগ কেনাবেচাও করে, এটা আমার ভালোমতোই জানা।

ধরে নেওয়া যাক, রহস্যময় লোকটি তার বাহিনী সমেত হাইওয়ে থেকে ফরেস্টের রাস্তা ধরে আসে বোলেরোর মতো ঢাকা গাড়িতে।

মনু সিংয়ের কাছে এই লোকটির কোনও লেনদেনের বকেয়া পাওনা ছিল। এরা প্ল্যান করে রেখেছিল যদি মনু কথামতো পুরো টাকা না দেয়, তবে ওরা ওকে অপহরণ করে নিজেদের গাড়িতে নিয়ে চটপট হাইওয়ে দিয়ে পালাবে।

ব্রিজের ওপর এই লোকটির থাকার কথা ছিল না। ওকে সেখানে দেখে মনুকে ব্রিজের মুখের কাছেই হঠাৎ দাঁড়াতে হয়। টাকা নিয়ে বচসা শুরু হতেই সেতুর তলাতে লুকিয়ে থাকা বাহিনী মনুকে গাড়ি থেকে টেনে বার করে। সেই সময় টানাটানিতে টাকাভরা ব্রিফকেসের হাতল ছেঁড়ে।

মতলব বুঝতে পেরে মনু চট করে পালাতে যায়, কিন্তু পারে না। শেষটায় এরা মনুকে ধরে ফেলে সেই গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়।

কিন্তু বেশ কিছু খটকা থেকে যাচ্ছে।

প্রথমত, মনু বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছিল ওর পরনে ছিল জিন্‌সের প্যান্ট আর স্নিকার, কোলাপুরি চটি নয়।

দ্বিতীয়ত, মনুর সঙ্গে কোনও ব্রিফকেস ছিল না। ছিল ব্যাকপ্যাক। খবরে অন্তত সেরকমটাই দেখিয়েছে। তাহলে স্পটে ওই ব্রিফকেসের ছেঁড়া হাতলটা এল কোত্থেকে?

তৃতীয়ত, প্লুটো মনুর কুকুর নয়। হলে অবশ্যই তা খবরে দেখাত। আর তাছাড়া নিজের কুকুরকে কেউ এরকম নির্দয়ভাবে মেরে ইথার দিয়ে অজ্ঞান করে অন্যের গাড়িতে ফেলে দেবে না।

তবে কি কেসটা উলটো? চকিতে একটা চিন্তার বিদ্যুৎ খেলে গেল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরেও আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তাহলে কি ওই কোলাপুরি চটি আর ব্রিফকেসের ভাঙা হাতল অন্য কারো? তাকেই কি গুম করা হয়েছে? সেই কি তবে প্লুটোর আসল প্রভু? এসি যতটা সম্ভব কমিয়ে দিয়ে মনে মনে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে লাগলাম।

সত্যি, আমি যদি এইভাবে ভাবি তবে অনেক ব্যাপার কিন্তু ঠিকঠাক খাপ খেয়ে যায়। অর্থাৎ ব্যাপারটা এইরকমও তো হতে পারে।

মনু সিংহের প্রধান দুনম্বরি বিজনেস ড্রাগ পাচার। আজ এই ব্যাপারেই ওর কাছে মোবাইলে যে যোগাযোগ করেছিল, সে তার পুরোনো আর বিশ্বস্ত হলেও, এর পয়সার খাঁই বেড়েই চলছিল। পুরোনো সঙ্গী হওয়ার দরুন এ অনেক ভেতরের কথাও জানত। ইদানীং তার মতিগতিও মনু সিংয়ের কাছে বিপদজনক ঠেকছিল।

সবদিক ভেবে মনু সিং একে চিরতরে সরিয়ে দেবার প্ল্যান করে এবং কিছু একটা লেনদেনের অছিলায় দেখা করার জন্য এই লাল মোরামের রাস্তার সেতুর নীচে আসতে বলে।

এই লোকটি একটি বোলেরোর মতো জিপে তার কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে হাইওয়ে থেকে ফরেস্টের রাস্তায় এসে নিকাশি নালার ওপর সেতুর কাছাকাছি এসে গেছিল।

সেই সময়ে মনু সিংয়ের গাড়ি ব্রিজের মাথায় ঢুকতে যাচ্ছে। আর সময় নষ্ট না করে কোনওরকমে গাড়িটা রেখেই পুরো দল নেমে পড়ে ব্রিজের তলায়।

এদের দেখে এই লোকটি পুরোনো অভ্যাসমতো ব্রিফকেস ভরতি ড্রাগ নিয়ে জিপ থেকে নেমে এদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু বিপদ বুঝতে পেরে পালাতে যায় ব্রিজের তলা দিয়ে।

পালানোর সুবিধের জন্য ও চটি জোড়া খুলে পালায় ব্রিজের দিকে। প্লুটো ওর ছোট মুখে কোনওরকমে একপাটি চটিই নিয়ে পিছন পিছন দৌড়োয়।

ব্রিজের মাঝ অবধি পৌঁছোনোর আগেই মনু সিংয়ের দলবল দুজনকেই ধরে মারধর করে এবং সম্ভবত তারপরে ইথার স্প্রে করে অজ্ঞান করে দেয়। কুকুরটাকে ওইখানেই কোনো ঝোপে ফেলে রেখে সেই লোকটিরই গাড়িতে ওকে তোলে এবং মনু সিংয়ের কোনও লোক, প্লুটোর প্রভুকে নিয়ে যায় জঙ্গলের রাস্তায়, খুব সম্ভবত নদীর ধারে।

মনু সিংহের প্ল্যান মাফিক গাড়ির ড্রাইভার এদের নামিয়ে আবার ব্রিজের কাছে ফিরে আসে। এই গাড়িতেই পরে মনু সিং সমেত পুরো দল ফেরত যায় কোনও গোপন ডেরায়।

আমি যখন ব্রিজের মুখে এসে পড়েছি তখন মনু সিং আর তার দলবল সেতুর তলায় ব্রিফকেস ভেঙে ড্রাগ প্যাকেটগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগিতে ব্যস্ত ছিল।

আমি নিজের বোলেরো থেকে নেমে টর্চের আলোতে চারপাশ দেখতেই ওরা আমি কিছু দেখে ফেলতে পারি এই ভেবে আমাকে মেরে অজ্ঞান করে দেয়।

মনু সিং আমাকে দেখেই চিনতে পারে এবং ঘটনাচক্রে আমার গাড়ি এবং সেই ড্রাগ পাচারকারীর গাড়ি—দুটোই এক রকমের বলে ওর মাথায় একটা দারুণ শয়তানি বুদ্ধি খেলে যায়।

আমার গাড়িটা সেতুর ওপারে রেখে প্লুটোকে তার কামড়ে থাকা কোলাপুরি চটি সমেত আমার গাড়িতে চড়িয়ে দেয়।

দূর থেকে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখতে পেয়ে ওর দলের একজন লোক আমারই গল্‌ফ ক্যাপ পরে বনেটের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যাতে দূর থেকে মনে হয় গাড়ির মালিকই ওখানে কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছে।

এই গাড়িটি চলে যাবার পরেই আর একটা গাড়ি অন্যদিক থেকে এসেছিল। ওরা কেউ না থাকলেও সদ্য জ্ঞান ফেরা প্লুটোর আর্ত চিৎকার সেই গাড়ির ড্রাইভার শুনতে পেয়েছিল।

মনু সঠিক আন্দাজ করে নিয়েছিল যে জ্ঞান ফিরে একটু শক্তি পাওয়ামাত্র আমি কোনওকিছু না দেখে সোজা হাইওয়ে মোড়ের দিকে পালাব। প্লুটো ইথারের ঘোরে আরও কিছুক্ষণ নির্জীব থাকবে।

মোড়ের মাথায় গাড়ি থামলে ও যদি মাথা বের করে দেখে তাহলে খুব ভালো। বাইপাসের দিক থেকে আসা একটা নীল রঙের বোলেরোতে একটা কালো স্পানিয়েল অনেকেরই নজরে পড়বে।

লোকাল নিউজ চ্যানেলটা থেকে মনুকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এরকম একটা ধারণা যাতে সবাই করে নেয়, সেইরকম ভাবে প্রচার চালানো হবে—এটাতো মনু আগেই ফেঁদে রেখেছিল। এখন আমি নীল বোলেরো সমেত এসে পড়াতে ওর অনেক সুবিধেই হল।

সমস্ত কিছু মিলিয়ে, বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য টিভিতে দেখিয়ে পুলিশকে ভালো ধোঁকা দেওয়া যাবে। পুলিশ যতক্ষণে এই নীল বোলেরোর মালিককে খুঁজে তাকে নিয়ে টানাটানি করবে, ততক্ষণে আসল নীল বোলেরো আর তার মালিককে যে ঠিকানায় পৌঁছোবার সেখানে বিনা বাধায় পৌঁছে দেবে ওরা।

মনু সিংয়ের চেলা-চামুণ্ডারা এখনো অবধি কোনও গোপন ডেরার খোঁজ পেল না আর কেনই বা এখনো অবধি মুক্তিপণ চেয়ে কোনও ফোন এল না, সেটা এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে।

দুটো থিওরির মধ্যে যেটাই সত্যি হোক, কাল সকালের মধ্যে পুলিশের গাড়ি আমাদের আবাসনে ঢুকে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এত সব উদ্বেগের মধ্যেও অন্ধকার ঘরে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ধড়মড় করে উঠে বসলাম। কাছেই যেন একটা সাইরেনের আওয়াজ শুনলাম মনে হল। তাহলে সত্যি সত্যি পুলিশ এসে গেল!

ঘর যেমন অন্ধকার ছিল তেমনি থাকুক, ব্যালকনি থেকে আগে দেখি তো একবার। লিভিং রুমে পৌঁছোতেই আর একবার শুনলাম সেই আওয়াজ। তবে এটা সাইরেনের নয়, প্লুটো মধ্যে মধ্যে কেঁদে কেঁদে উঠছে। কিন্তু ঠিক তারপর জড়ানো গলায় শুনলাম, 'রো মত রাজা, রো মত। ডোন্ট ক্রাই রাজা, ডোন্ট ক্রাই'। রাজা তো আমারও ডাকনাম।

প্লুটো ওরফে রাজার প্রভু তাহলে তার কুকুরের সন্ধানে এসে গেছে আমার ফ্ল্যাটে। কী করে ঢুকল এখানে?

কুকুরটা আর একবার কেঁদে উঠতেই এবার পরিষ্কার শুনলাম পুরুষকণ্ঠে কে যেন বলছে, 'চুপ হো যা রাজা, চুপ হো যা, ফির আয়েঙ্গে হাম।'

চুপিসাড়ে ব্যালকনিতে এসে প্লুটো ছাড়া কাউকে দেখতে পেলাম না।

'প্লুটো, প্লুটো' বলে একটু জোরে ডাকতেও প্লুটো আমার দিকে চেয়েও দেখল না। আমি এবার গলা নামিয়ে অনেকটা সেই পুরুষকণ্ঠ নকল করবার চেষ্টা করে ডাকলাম 'রাজা।'

ডাকতেই ও উঠে দাঁড়াল, কিন্তু মনে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমার দিকে বেশ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে ব্যালকনির রেলিং-এর দিকে চেয়ে রইল।

ব্যাপারটা বোঝার জন্য সব ক'টা ঘর যেমন আঁধার ছিল সেইরকম রেখে ডিভানে ঘাপটি মেরে আধশোয়া হয়ে জেগে থাকবার চেষ্টা করলাম। এভাবে কতক্ষণ গেল, বলতে পারব না।

কে যেন আমাকে একটা ঠেলা মারল আর আমি চোখ খুলে দেখি সবে মাত্র ভোর হয়েছে।

প্লুটো ডিভানের কাছেই শুয়েছিল, ও গেল কোথায়? গোটা ফ্ল্যাট তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ওর আর ওর মনিবের কোলাপুরি চপ্পলের টিকি পেলাম না। গেল কোথায়?

ব্যালকনি থেকে পুরো আবাসন চত্বর দেখা যায়। সেই দিকে দেখতে দেখতে চোখ আরও এগিয়ে চলল।

উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্ত তখনও পাতলা কুয়াশার নরম রেশমি চাদরের হালকা আঁধারে ডুবে আছে। শুধু পুবের আকাশে হালকা গোলাপি আলোর তুলি বোলানো চলছে। আমার ভাগ্য এখন কোন দিগন্তে আটকে আছে, জানি না।

পুবদিকেই সেই নিকাশি নালা যার ওপর দিয়ে লাল মোরামের রাস্তাটার সেতু আছে। সেটা এই আবাসনের থেকে আধা কিলোমিটার দূরে দুপাশের ঘন জঙ্গলের মাঝে বয়ে সোজা নদীতে গিয়ে মিশেছে।

পুবের আকাশ এবার গোলাপি লাল। সেই প্রেক্ষাপটে বৃত্তাকারে ঘোরা উড়ন্ত একপাল কালো শকুনির সিলুইয়েট ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা কথা মনে হল।

শুনেছি কোনও কোনও কুকুর অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি আর ঈশ্বরদত্ত অনুভূতির জন্য নিজেদের মনিবদের অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনার ঠিক আন্দাজ করতে পারে।

নদী তীরের কাছে উড়ন্ত শকুনের পালকে দেখে আমি এতক্ষণে প্লুটোর প্রভুর যে দশা আন্দাজ করছি, প্লুটো সেটা হয়তো শেষ রাতেই বুঝে নিয়েছে।

ব্যালকনির গ্রিলের ফাঁক দিয়ে গলে, আসা-যাওয়ার শর্ট-কাটের জন্য কমপ্লেক্সের কোনও দেওয়ালের বড় গর্ত দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সে হয়তো তার প্রভুর দেহাবশেষের সঙ্গে শেষ দেখা করতে গিয়েছে।

কমপ্লেক্সের মেন গেটের সামনে একটা পুলিশ জিপ ঢুকল। গেটে সিকিউরিটি লাঠি উঁচিয়ে আমার ফ্ল্যাটের দিকে দেখিয়ে দিল। একটা আর্তনাদ দিয়ে কান্না আমার গলা থেকে বের হতে গিয়েও পারল না। তার আগেই কোনও অদৃশ্য হাত আমার কাঁধে শীতল হাওয়া হয়ে কানে কানে আমার ডাক নাম ধরে সান্ত্বনা দিতে থাকল---'কেঁদো না, রাজা কেঁদো না, আমি সব ঠিক করে দেব।'

কে সে? আমার ভ্রম নাকি নিশিরাতে আসা সদ্য অশরীরী হয়ে যাওয়া প্লুটোর প্রভু?

গল্প প্রতিযোগিতার হ্যাটট্রিক

এবার

অশরীরী গল্প

প্রতিযোগিতা

কিশোর ভারতী পত্রিকার পক্ষ থেকে আবার আয়োজন করা হয়েছে অশরীরী-অলৌকিক গল্প প্রতিযোগিতা। শ্রীসাধনচন্দ্র সরকারের অনুরোধে ও অর্থসহায়তায় এই প্রতিযোগিতা উৎসর্গিত হয়েছে তাঁর প্রয়াত কন্যা তথা কিশোর ভারতীর একনিষ্ঠ পাঠক সোহিনী সরকার-এর স্মৃতির উদ্দেশে।

- সোহিনী-স্মৃতি গল্প প্রতিযোগিতায় কোনও বয়সের ঊর্ধ্বসীমা নেই। আগ্রহী সকলেই যোগ দিতে পারেন।
- শব্দসংখ্যা অনূর্ধ্ব 3500।
- কাগজের একপিঠে বা কম্পিউটারে লিখতে হবে।
- কিশোর ভারতীর বিচারকমণ্ডলীর রায় চূড়ান্ত।

পাঁচটি আকর্ষণীয় অর্থমূল্যের পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার 3000.00

দ্বিতীয় পুরস্কার 2000.00

তৃতীয় পুরস্কার 1000.00

সান্ত্বনা পুরস্কার (2টি) 500.00

কিশোর ভারতীর সম্পাদকীয় বিভাগে গল্প পৌঁছোবার শেষ দিন 28 মার্চ 2015।

পুরস্কৃত গল্প 5টি ছাড়াও অন্য গল্প যদি পছন্দ হয়, সেগুলিও পত্রিকার মাসিক সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গুটি গুটি পায়ে পাড়ি দাও ভয়ের দুনিয়ায়

বি. দ্র : গল্পের নামের পাশে 'গল্প প্রতিযোগিতা' লেখা আবশ্যক।

রহস্য গল্প প্রতিযোগিতায় **সান্ত্বনা পুরস্কার** প্রাপ্ত গল্প

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

পুকুরচুরি

ভরা এজলাস। শুনানি চলছে। সরকারি উকিল তাঁর বক্তৃতার মাঝ বরাবর। জজসাহেব চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। দরদর করে ঘামছেন। চোখ বন্ধ।

সরকারি উকিল কথা থামিয়ে দিলেন। কী করবেন বুঝেও পাচ্ছেন না। আর্দালি ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল। জজসাহেবের সাড়া নেই।

পৌষের শেষ দিক। বেলা গড়িয়ে গেছে। টাই-কোট আলগা করে দিয়েও জজসাহেবের ঘাম শুকোচ্ছে না। তিনি অজ্ঞান। কোর্ট ইনস্পেক্টর দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করলেন। আদালত সেদিনের মতো মুলতুবি হয়ে গেল।

নামি নার্সিং হোমের চিকিৎসায় আর পরিচর্যাতে জজসাহেব চোখ মেলে তাকালেন ঘণ্টাখানেক পর। তক্ষুনি ছাড়া মিলল না। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ডাক্তাররা তাঁকে কেবিনবন্দি করে রাখলেন।

কেবিনে দুজন দুজন করে ঢুকছেন। সবাই উদ্বিগ্ন। দু-একটির বেশি কথা বলা বারণ। তিনি স্মিত মুখে বিছানায় আধশোয়া হয়ে সকলের শুভেচ্ছা নিচ্ছেন। পাশে চেয়ারে বসে তাঁর অর্ধাঙ্গিনী। মুখে হাসি নেই।

কেবিন ফাঁকা হলে স্ত্রীর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—সবাই মিছিমিছি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিছু হয়নি আমার। তোমারও তুয়াকে ফোন করার কোনও দরকার ছিল না। কাজকর্ম ফেলে ছেলেটাকে শুধু শুধু ছুটে আসতে হবে।

আরতি দেবী ম্লানমুখে জবাব দিলেন,—আসবেই তো! বাবা নার্সিং হোমে ভর্তি, ছেলে হায়দ্রাবাদে পড়ে থাকবে? হয় কখনও!

ছবি তাপস মণ্ডল

—না জানালেই হয়! দেখতেই তো পাচ্ছ। ভালো আছি। মাঝখান থেকে তোমাদের দুর্ভোগ।

—দুর্ভোগ কার? সত্যি করে বলো তো, ঠিক কী হয়েছিল? বুকে ব্যথা? শ্বাসকষ্ট?

—না, না, সে সব কিছু নয়। কী যে হয়েছিল বলা মুশকিল। কেসটা শুনতে শুনতে হঠাৎ একজনের কথা মনে পড়ে গেল। ভয়ংকর একটা অভিজ্ঞতার স্মৃতি। ব্যস! আর মনে নেই।

—কে সে? আরতি প্রশ্ন না করে পারলেন না।

জজসাহেব কিছু বলবার আগেই কেবিনে ঢুকে পড়লেন ডা. বসাক। মুখে হাসি।

—গুড ইভনিং স্যার! আর কথা নয়। সরি ম্যাডাম! স্যারকে এখনই স্ক্যানিং-এ নিয়ে যাব। আপনি একদম চিন্তা করবেন না। আমরা আছি।

পরের দিন সকালেই তুয়া এসে গেল। এসেই খবরটা পড়ে নিয়েছে। একটা নামি খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বাঁদিকের প্রথম কলামে।

শিরোনাম ঃ বিচারক অসুস্থ।

শ্রীরামপুর ঃ গতকাল অপরাহ্নে হিয়ারিং চলাকালীন এ-সি-জে-এম নিশীথ মিত্র সহসা গুরুতর অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারান। তাঁকে তৎক্ষণাৎ নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও তিনি পর্যবেক্ষণে থাকবেন।

আদালত সূত্রের খবর, সেই সময় তাঁর এজলাসে অদ্ভুত একটি মামলা চলছিল। সেটিকে প্রকৃত অর্থেই পুকুরচুরি আখ্যা দেওয়া যায়। পুরুলিয়া জেলার খরাপীড়িত এক গ্রামের দীঘি থেকে রাতারাতি জল পাচার হয়ে গেছে। অভিযোগ, পাশের গ্রামের দুটি বড় পুকুরে সেই জল চুরি করে এনে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগকারী শ্রীরামপুরের বাসিন্দা। তিনি অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তি এবং তিরিশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

নিশীথবাবু সুস্থ হয়ে কাজে না ফেরা পর্যন্ত মামলাটি স্থগিত থাকবে নাকি অন্য বিচারকের অধীনে পেশ হবে, তা এখনও স্থির হয়নি।

খবরটা পড়ার পর থেকে তুয়ার চিন্তা বেড়ে গেছে। নার্সিং হোমে গিয়ে বাবার দেখা পেল না। কাল গভীর রাতে তাঁকে আই সি ইউ-তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ডাক্তার বসাকের সঙ্গে দেখা করার জন্যে মা আর ছেলে লাউঞ্জে বসে রইল।

খুব বড় নার্সিং হোম। বোর্ডে ভর্তি থাকা রোগীদের নামের পাশে চিকিৎসকের নাম। চারিদিকে ব্যস্ততা।

স্পিকারে ঘোষণা হল, 'নিশীথ মিত্র-এর বাড়ির লোক উপস্থিত থাকলে রিসেপশনে যোগাযোগ করুন।'

তুয়া হন্তদন্ত হয়ে কাউন্টারে হাজির। পিছনে ফিরে দেখে মা-ও চলে এসেছে। উদ্বিগ্ন মুখে জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছে রে তুয়া?

—কিছু না মা। মনে হচ্ছে পেমেন্টের ব্যাপার।

কম্পিউটারের মেয়েটি কম্পিউটার থেকে বিল বের করে দিয়ে বলল,—পেমেন্ট মিটিয়ে অপেক্ষা করুন। ডাক্তার বসাক আসছেন।

আরতি দেবী সিটে ফিরে গেলেন। কার্ডে টাকা মিটিয়ে পা বাড়াতেই সামনে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। ধুতির ওপর শাল। হাত দুটি জোড় করা।

—নমস্কার। আমি চিত্ত পট্টনায়ক। পুরুলিয়া থেকে আসছি। আপনি নিশ্চয়ই নিশীথ মিত্রের ছেলে।

প্রতি নমস্কার জানিয়ে তুয়া বলল,—হ্যাঁ। আমার নাম প্রত্যুষ। বলুন।

—জলচুরির মামলাটা আমারই বিরুদ্ধে করা হয়েছে। জল কিন্তু আমি চুরি করিনি। বিশ কিলোমিটার দূরে রমেন চৌধুরীর ওই বিশাল বাঁধ থেকে রাতারাতি জল পাচার করা শুধু আমার কেন, কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

তুয়া জিগ্যেস করল,—বিশাল মানে কত বড়?

—সাড়ে তিন একরের মতো। গভীরতা ধরুন দু'মিটার।

তুয়ার মাথায় অঙ্ক। এক একর মানে মোটামুটি চারহাজার বর্গমিটার। সাড়ে তিন একরে চোদ্দ হাজার। দু-মিটার গভীরতায় হয় আটাশ হাজার ঘনমিটার। অতখানি জলকে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় কুড়ি কিলোমিটার নিয়ে যাওয়া মানে অসাধ্য সাধন।

জিগ্যেস করল, ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছে?

—ঘটেছে। ওই বাঁধ থেকেই জল গেছে আমার জোড়া দীঘিতে। এবং এক রাতেই।

—তাহলে তো চুরিটা আপনি স্বীকার করছেন।

—ঘটনা তাই, কিন্তু প্রমাণ হবে না। অবিশ্বাস্য ধাঁধা একটা। কোনও ভাবেই কাউকে কনভিন্স করানো সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছিল। চিত্তবাবুর গলা চড়ে যাচ্ছে। চারপাশের লোকজন ওদের দিকে তাকাচ্ছে তেরছাভাবে। তুয়া সাবধান হল। দাঁড়িয়ে পড়ে বলল,—আপনার কথা আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। তাছাড়া আমাকে এসব বলার কারণটাই বা কী?

পট্টনায়ক গলা নামিয়ে বললেন,—কারণ আমি জানি আপনি ওয়াটার রিসোর্স নিয়ে মাস্টার্স করছেন। বেসিকালি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।

আরও একটা কারণ হল, যে ক'জন আমরা এই মামলার সঙ্গে জড়িত, সকলেই কিন্তু সহপাঠী। ওই রমেন, আমি, তোমার বাবা প্রেসিডেন্সিতে পড়েছি একসঙ্গে। রমেন আছে সি ইউ কাউন্সিলে, আমি পুরুলিয়া কলেজে, তোমার বাবা জুডিসিয়ালে। আরও একজন আছে। তার কথা পরে বলব।

তুয়া ভালো করে ভদ্রলোককে দেখল। বাবার বয়সি মনে হয়। বলল,—বাবার মুখে আপনাদের নাম খুব একটা শুনিনি। মনীশ ধর কাকুর নাম শুনেছি। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক।

নামটা শুনে চিত্ত পট্টনায়ক একটু চমকে উঠলেন যেন। তুয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন,—আপনি...মানে তুমি ওকে চেনো?

—ছোটবেলায় অনেক দেখেছি। আমাদের বাড়িতে আসতেন। ইদানীং আর দেখা হয় না। আপনার সঙ্গে হয়?

—খুব ব্যস্ত মানুষ! বলতে বলতে চিত্তবাবুর চোখ সরে গেল অন্যদিকে। ঘাড় ঘুরিয়ে তুয়া দেখল মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন একজন। গায়ে সাদা অ্যাপ্রন।

মা ওকে ইশারায় ডাকলেন। পা বাড়িয়ে তুয়া বলল,—কাকু! চলে যাবেন না। পুরো ঘটনাটি আমি আপনার মুখে শুনতে চাই। আমার নিজের অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট।

—সবটা বলার কিন্তু সমস্যা আছে। পট্টনায়ক বললেন,—গোপনীয়তা রক্ষার চুক্তি আমি ভাঙতে পারি না। যতক্ষণ না সেই পক্ষের অনুমতি পাই।

মা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এদিকেই আসছেন। চিত্তবাবুকে দেখে ডাক্তার দাঁড়িয়ে পড়লেন,—কাল রাতে মনীশ ধরের সঙ্গে আপনি মিত্র সাহেবকে দেখতে এসেছিলেন না?

—হ্যাঁ, ডাক্তার বসাক। আপনার অশেষ অনুগ্রহ। চিত্তবাবু দু-হাত জোড় করলেন,—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

ডঃ বসাকের গলা গম্ভীর শোনাল, বললেন,—পাঁচমিনিটের জন্যে পারমিট করেছিলাম। পনেরো মিনিট হয়ে যাবার পর আমি নিজে গিয়ে ডেকে আনতে বাধ্য হই।

—সরি ডক্টর! নিশীথ ছাড়তে চাইছিল না।

কথা না বাড়িয়ে ডাক্তার নিজের চেম্বারে চললেন। যেতে যেতে পিছন ফিরে চিত্তবাবুর দিকে তাকাল তুয়া!

কীসের গোপনীয়তা! চুক্তি কী নিয়ে। ওর দৃষ্টিতে সন্দেহের সঙ্গে মিশে আছে অবিশ্বাস। বাবা কী এই মামলার ভেতরে কোনও গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছেন?

রাতে ল্যান্ডলাইনে একটা ফোন এল। আরতি ওষুধ খাচ্ছিলেন। তুয়া ধরল।

—কে? তুয়া? আমি মনীশকাকু বলছি। চিনতে পারছ?

—হ্যাঁ। কেমন আছেন?

—ভালো নেই রে! চারদিকে গণ্ডগোল। কাজের চেয়ে অকাজই বেশি। বাবা কেমন আছেন?

—কাল রাতে তো আপনি বাবাকে দেখতে গিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ রে, খবরটা পড়ে না গিয়ে থাকতে পারিনি। আমি একা নয়। সঙ্গে চিত্ত পট্টনায়কও ছিল।

নিশীথ মিত্র বাড়ি এসেছেন আজ তিনদিন।

সন্ধ্যায় ডাইনিং হল-এ জমাটি মজলিস। চারবন্ধু অনেকদিন পরে এক জায়গায়। আরতি আর তুয়াকে নিয়ে ছজন। প্রাথমিক চা-পর্ব শেষ। আরতি রান্নাঘরে। নৈশ আহারের প্রস্তুতি চলছে।

আড্ডা ক্রমে প্রাণখোলা। মনীশ একসময় জানতে চাইলেন, আমি কি তাহলে এই সব ঝামেলা থেকে রেহাই পাচ্ছি?

কথাটা ধরে নিয়ে চিত্ত বললেন,—তুমি তো সরাসরি অ্যাকিউজড নও। অবশ্য জজসাহেব এনকোয়ারির অর্ডার দিলে আর রক্ষা নেই। ধরা পড়ে যাবে। তার আগে আমার ছাড় পাওয়াটা খুব জরুরি। রমেন, তুই কী বলিস?

—আমি আর কী বলব? রমেনের কুণ্ঠিতস্বর,—নিশীথই বলুক।

নিশীথ নড়েচড়ে বসলেন। তাঁর গলায় নিমেষে জজসাহেব হাজির। গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন,—যা শুনলাম, তাতে হুড়োপাড়া করে কেসটা ফাইল করা ঠিক হয়নি। জল পরিবহণের অভূতপূর্ব পদ্ধতিটি যতদিন না ফর্মালি প্রকাশ্যে আসে, ততদিন টপ সিক্রেট রাখাই ভালো। মহৎ একটি গবেষণার স্বার্থে এটাকে অপরাধের আওতায় এনে ফেলাটা একেবারেই অনুচিত।

নিশীথ থামতেই মনীশ বলে উঠল,—ব্রাভো!

চিত্ত সেটাকে সহর্ষে সমর্থন করলেন, রমেন নীরব।

নিশীথ মনীশের দিকে চেয়ে বললেন,—ব্রিফিং শুনেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম, এটা তোমরাই কাজ। যতই ফিজিক্সের এইচ.ও.ডি হোক, চিত্তর একার পক্ষে কাজটা অসম্ভব। শুনতে শুনতে আমার সেই ভয়ংকর ঘটনা দুটোর কথা মনে পড়ে গেল। দমবন্ধ হয়ে বুক ফেটে যাবার জোগাড়। ব্যস! ব্ল্যাক আউট!

অপরাধী মুখে মনীশ বললেন,—তাও তো মাত্র তেরো সেকেন্ড রেখেছিলাম তোমাকে। মিনিমাম ব্রেদলেস টাইম। আমার সাতাশ। মালি ছেলেটা তো অনায়াসে তেত্রিশ সেকেন্ড থাকতে পারত।

নিশীথ বিচলিত হলেন,—ওই ছেলেটার কথা আর মনে করিয়ে দিয়ো না মনীশ। কী মর্মান্তিক পরিণতি!

আরতি এদিকেই ফিরছিলেন। কথাগুলো কানে যেতে জিগ্যেস করলেন,—কীসের কথা বলছ?

মনীশ আড়ষ্ট গলায় বাধা দেবার চেষ্টা করলেন,—না, মানে, বউদি...।

নিশীথ থামিয়ে দিলেন,—আমি বলছি তোমাকে। তখন বহরমপুর কোর্টে সদ্য পোস্টিং পেয়েছি। মনীশ কোনও কাজে এসেছিল। দেখা করতে এল। পাঁচ ছ'বছর পরে দেখা। মাঝে একদম খোঁজ ছিল না। বলল, এমন একটা বিষয়ে গবেষণা করছে যেটা সফল হলে সারা দুনিয়ায় সাড়া পড়ে যাবে। প্রকৃতি আর মানুষ দুয়েরই অকল্পনীয় উপকার।

একটু-আধটু হিন্টস্ দিচ্ছিল। ভারী ইন্টারেস্টিং। আমার আগ্রহ দেখে ওদের টেস্টিং ক্যাম্পাসে আমন্ত্রণ জানাল। ব্যাপারটা খুবই সিক্রেট। ঠিকানা না দিয়ে একটা ফোন নম্বর দিল। দিন স্থির হলে নিজে এসে বোধিঘাট থেকে তুলে নিয়ে যাবে।

গেলাম এক ছুটির দিনে। গাড়িতেই প্রায় আধঘণ্টা। উঁচু পাঁচিল ঘেরা বিশাল জায়গা। লোহার গেট। বাইরে ছোট্ট একটা বোর্ডে লেখা আছে প্রাইভেট। আশেপাশে কোনও জনবসতি নেই। বিশেষ সংকেত গেটখুলে গেল। ভেতরে অনেকগুলো বাঁধানো জলাশয়। গাছপালার ফাঁকে কয়েকটা একতলা বাড়ি। শেড।

হ্যাঙ্গার থেকে ছোট একটি কপ্টার প্লেন বেরিয়ে এল। মনীশ সেটাতে উড়ে এসে একটা পুকুরের সামান্য ওপরে ভেসে রইল। আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে। হাতে ওয়াকি টকি। মনীশ প্লেন থেকে কথা বলে বোঝাচ্ছে।

প্লেনের তলা থেকে একটা উজ্জ্বল আলোর রশ্মি এসে পড়ল জলে। ইনডিউস্ড সাকশন চালু করতেই জল ঘুরতে ঘুরতে ফুলে উঠে ওয়াটার স্পাউট ফর্ম করল। প্লেন খাড়া লিফট নিচ্ছে আস্তে আস্তে। জলস্তম্ভের উচ্চতাও বেড়ে চলেছে।

—লক্ষ রাখো, মনীশের গলা শোনা গেল,—এখন সাইফোনিক ডিসপ্লেসমেন্ট দেখতে পাবে।

কপ্টার প্লেন ভেসে ভেসে পাশের পুকুরের ওপর স্থির হয়ে রইল। জলস্তম্ভটাও ঘুরতে ঘুরতে এগোচ্ছে। প্লেনের পেট থেকে আবার একটা তীব্র রে ওই পুকুরটায়। ওয়াটার স্পাউট রেনবোর আকার নিল। আলো বেয়ে সোজা নামতে লাগল জলে। প্লেন স্থির। মোটা ঘূর্ণি ধারাটি রামধনু হয়ে দুটো পুকুরকে ছুঁয়ে আছে। এদিকের জল বয়ে চলেছে ওদিকের পুকুরে।

—এবার ওরিজিনাল স্পাউটটা ডিসকনেক্ট করছি। মনীশ জানাল।

সঙ্গে সঙ্গে আসল স্তম্ভটি ভার্টিকালি বিচ্ছিন্ন হয়ে আগের পুকুরে ঝরে পড়ল। রেনবোর বাকিটা ঝড়ে পড়ল পরেরটায়। এটাতে জল যতটা বাড়ল ততটাই কমল ওটাতে। আমি অবাক! কনগ্রাচুলেশন জানিয়ে চলে আসব, মনীশ বলল,—যেয়ো না। জিরো গ্রাভিটেশনের এফেক্টটা দেখে যাও।

একটি ছেলে জলে নেমে দাঁড়াল। রে এসে পড়ল ঠিক পাশে। ছেলেটা জলস্তম্ভের ঘূর্ণির ভেতরে টেনিস বলের মতো ঘুরতে ঘুরতে ভেসে রইল। সাকশন কমাতে কমাতে তাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল আবার।

অবাক আর হচ্ছি না। মজা পাচ্ছি। মনীশ প্লেন থেকে বলল,—এনজয় করতে চাইলে ড্রেস চেঞ্জ করে জলে নামো।

আমি ল্যাবোরেটরিতে গিয়ে ওদের পোশাক পরে এলাম।

মনীশ নিশীথ-এর কথার মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠলেন,—তুমি কিন্তু একবারও আপত্তি করনি সেদিন।

নিশীথ শান্ত গলায় বললেন,—তোমার কোনও দোষ নেই। সেদিন আমার গিনিপিগ হওয়ার নেশা চেপেছিল। জলে নামার পর দুর্দান্ত ঘূর্ণির মধ্যে ঢুকে পড়ে আমি আস্তে আস্তে শূন্যে উঠছি। শূন্য নয়, আটষট্টি কেজি ওজন আর পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতা নিয়ে আমি লাট্টুর মতো ঘুরপাক খেতে খেতে ওয়াটার স্পাউটের মধ্যে ঝুলে রয়েছি; সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সের দরুন কেন্দ্রে জল ঘন। সেখানে ড্রিলের ফলার মতো বেগে ঘুরে চলেছি। ছেলেবেলায় পুকুরের গভীরে ডুব দিয়ে পাঁক তুলে আনার বাজি ফেলার কথা মনে পড়ছে। দুকানে প্রচণ্ড চাপ। চোখে অস্পষ্ট সবুজ আলো। ঘুরন্ত জলস্তম্ভের মধ্যে দম যেন ফুরিয়ে এল। খামচে খামচে জলকেই ধরতে চাইছি বারবার। কতক্ষণ জানি না। মনে হচ্ছে যুগের পর যুগ। এই সময় ঝুপ করে জলে নেমে এলাম। চোখের সামনে ভেতরে সব অন্ধকার।

মনীশও কপ্টার ল্যান্ড করিয়ে নেমে এসেছিল। একটু সুস্থ হতে প্রশ্ন করল,—কেমন বুঝলে?

কী বলেছিলাম এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বললাম,—মৃত্যুটা কেমন সেটা বুঝলাম।

মনীশ খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বলল,—সরি, তোমার দম এত কম বুঝতে পারিনি। আগে ব্রিদিং গ্যাপটা চেক করা উচিত ছিল।

আরতি মনীশের দিকে কড়া চোখে তাকিয়েছিলেন। নিশীথ ফের বললেন,—গোটাটাতো এখনও বলা হয়নি আমার। চেঞ্জ করে নিজের ড্রেসে ফিরে যাব, মনীশ বলল, আর একটু থাক। কিছু করতে হবে না। শুধু দেখবে।

বারান্দায় চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে দেখা। ছেলেটি জলের সঙ্গে উড়ে রেনবো-র ভেতরে দিয়ে এদিকের ট্যাঙ্কে এসে নামবে। গোটা ব্যাপারটা ত্রিশ থেকে বত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে যাবে।

—কী যে হল! একচুলের জন্যে পেরে উঠলাম না। বলতে বলতে মনীশ দু-হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরলেন,—ক্যালকুলেশন ঠিক ছিল। সামান্য একটু সময়ের ভুলে...টার্বো প্রেশারটা...

সকলেই শেষটুকু শোনার জন্যে উদগ্রীব। মনীশ মাথা তুলছেন না। কথাও বলছেন না। সবাই চুপ।

নিশীথই নীরবতা ভাঙলেন,—ছেলেটা পঁচিশ সেকেন্ড ওয়াটার স্পাউট বেয়ে রেনবোতে ভাসছিল। আর পাঁচ সেকেন্ডে এদিকের ট্যাঙ্কে এসে নামার কথা। হল না। তিন সেকেন্ডে আছড়ে পড়ল বাঁধানো পাড়ে। আমি চোখ বুজে ফেললাম।

মনীশ মুখ তুললেন। ভাঙা গলায় বললেন,—ছেলেটা থাকলে আমি আরও অনেক আগেই এক্সপেরিমেন্টগুলো শেষ করে ফেলতে পারতাম।

কথা না বলে মনীশ শুধু ঘাড় দোলালেন।

সবাইকে একবার দেখে নিয়ে নিশীথ বললেন,—আমি ভুলতে পারিনি। ওই স্মৃতিটাই সেদিন এজলাসে আমায় অসুস্থ করে দিয়েছিল।

জয়ন্ত দে

কিছু মেঘ, কিছু কুয়াশা

অনীশদা, ত্রিদিবদা, অভিজ্ঞান, সৈকত, হিমাদ্রি, দীপান্বিতা, অনন্যা ও দেবতোষের পর আমি। শুরু হয়েছিল চার বন্ধু সিদ্ধেশ, মেরুন, চিন্নি আর জ্যোতিষী তান্ত্রিক প্রলয়েশদের প্ল্যানচেটের পর্ব দিয়ে। প্ল্যানচেটে না এসে খুন হয়ে যায় ওদের আর এক বন্ধু সিতি। তার খুনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে ক্লাস টেনের অর্ক। পুলিশি তদন্তের মাঝেই খুন হয় অনামিকা। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চিন্নি ওরফে চিন্ময়ী সরকার উধাও। ক্রমশ কেসটা আর সাধারণ খুনের ঘটনা থাকে না। হেভি মেটাল তো আছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে টেররিজমের এগেন্সটে লড়াই করা 'কল্কি'র নাম। চিন্নি সেই কল্কির মেম্বার। তার পিছনে হন্যে হয়ে ছুটছে পুলিশ। সে চলে গিয়েছিল দীঘার তালসারিতে। এখন সে কলকাতায় এসেছে ১৪ ফেব্রুয়ারির কল্কির কোনও এজেন্ডা নিয়ে। তার পিছনে আইপিএস মধুবন্তী সেন ও অনঙ্গ দেব।

রহস্যটা পুরো জানতে হলে প্রথম থেকে পড়তে হবে। আগের সংখ্যাগুলো অবশ্যই সংগ্রহ করে পড়ে নাও—লেখক।

ছবি সুদীপ্ত দত্ত

১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে।

ডিআইজি সিআইডি, সিনিয়ার আইপিএস মধুবন্তী সেন তারিখটার দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। এদিন কলকাতায় কিছু একটা ঘটবে? কী ঘটবে? কোনও বিস্ফোরণ, অথবা ২৬/১১-র মতো সামনাসামনি কোনও হামলা? না কি অন্য কিছু? এমনই কি ঘটাতে চাইছে কল্কি। টেররিজমের এগেন্সটে যারা টেররিজমের পথেই চলেছে, সেই কল্কির সদস্যদের পাঠানো বার্তা থেকেই এমন তথ্য মিলেছে।

দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে যে খবরটা এসেছে সেটাকে সামনে রেখেই আপাতত মধুবন্তী সেন তার কাজ ঠিক করছিল। এই পর্বে এতদিন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তাতে দেখা যাচ্ছে—চিন্ময়ী, চিন্ময়ী সরকার, চিন্নিই আপাতত এখানকার টপ পজিশনের মেম্বার। সেখান থেকেই গেমটা অপারেট করছে।

মধুবন্তী এ-ও জানে, চিন্নির ওপরেও অনেক বড় বড় মাথা আছে। কিন্তু আপাতত ওকে টার্গেট করেই এগোতে হবে। হদিশ করতে হবে ওদের জাল কলকাতা বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে কতদূর বিস্তৃত? বা আরও কারা কারা জেনে বা না-জেনে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে? অনেক প্রশ্নের উত্তর চিন্ময়ী জানে। চিন্ময়ীকে ধরতে পারলে অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে।

মেয়েটিকে মধুবন্তী দ্যাখেনি। সিতি খুনের কেসে অনঙ্গ ওকে ইন্টারোগেট করেছিল। পুরোপুরি ধোঁকা খেয়েছে। তারপর মেট্রো স্টেশনেও ট্রেন বদলে মেয়েটা ওদের ফাঁকি দিয়েছে। তখনও অনঙ্গরা অতটা ভাবেনি, ভাবেনি মেয়েটা ওদের নিয়ে এতটা খেলা খেলতে পারে! তারপরে, ওরা যদি একটু সতর্ক থাকত তবে সিদ্ধেশের ঠাকুদার বাড়িতে মেয়েটা এসেছিল। সিদ্ধেশ মেঘনা মেরুনের সঙ্গে মিটিং করেছিল। মেয়েটার ভোলাভালা সহজ সরলভাবই ওর মুখোশ।

অনঙ্গ দেব চিন্ময়ীর ফোনের কল লিস্ট অ্যানালিসিস করতে দিয়েছিল। রিপোর্টটা পেয়েছে পরশু। বেশিরভাগ ফোনই বন্ধুবান্ধবদের। সিতি, মেরুন, প্রলয়েশের মতো বন্ধুদের। কিন্তু সেই লিস্টে একটা নম্বর ভারী অদ্ভুত! সেখানে ফোন হয়েছে প্রতি রবিবার, ঠিক সকাল এগারোটায়। গত তিন মাস ধরেই চলছে। একটা ল্যান্ড লাইন নম্বরে ফোনটা করা হয়।

ফোন নম্বরটা সাউথ চব্বিশ পরগনার ক্যানিং থানার রসুলপুরের। প্রতি ক্ষেত্রেই তিন-চার মিনিট করে কথা হয়েছে। সপ্তাহের অন্য কোনও দিন ওই নম্বরে আর ফোন হয়নি, বা কোনও ফোনও আসেনি। যা হয়েছে তা শুধুমাত্র রবিবার—সকাল এগারোটায়।

পরশুই ওই নম্বরে অনঙ্গ একটা ফল্‌স ফোন করেছিল। বলেছিল—টেলিফোন কোম্পানি থেকে ফোন করছে, ওই ল্যান্ড লাইন যার, তাকে একটি গিফ্‌ট দেওয়া হবে। একটা হাত ঘড়ি। দেবে টেলিফোন কোম্পানি।

শুনে লোকটা খুব খুশি হয়েছিল। নাম-ঠিকানা নিয়ে আজ ভোর ভোর বেরিয়ে পড়েছে বিকাশ। একটা ঘড়ি কিনতে হয়েছে কাল। সেটাও সঙ্গে আছে। এছাড়াও কিছু কাগজপত্র যেগুলো গিফ্‌টের প্রমাণ স্বরূপ পৌঁছে যাবে সকাল দশটার মধ্যে। এক ঘণ্টা এইসব গিফ্‌টের কাগজপত্র সইসাবুদ করতে কেটে যাবে। এগারোটায় আজও নিশ্চয় চিন্নি ফোন করবে। ওই নম্বরটাই মধুবন্তীর চাই। এই ফোন নম্বরের লোকেশন ট্রেস করতে পারলেই চিন্নির খেল খতম।

মধুবন্তী, অনঙ্গ আজ সবাই কন্ট্রোল রুমে।

বিকাশ ঠান্ডা মাথার ছেলে। আশা করা যায় ও কাজটা গুছিয়েই করে আসতে পারবে।

বিকাশ যখন রসুলপুরে পৌঁছোল তখন সকাল ন'টা পঞ্চাশ। রসুলপুরে ঢোকার মুখেই সে গাড়ির সামনে ও পিছনে বিএসএনএল-এর কাগজ সেঁটে দিল। কোনও রকম বুঝতে দেওয়া চলবে না সে কোথা থেকে আসছে, কেন আসছে। রবিবার সকাল এগারোটার ফোন কলটা খুবই মহার্ঘ্য। চোদ্দো তারিখের আগে দুটো রবিবার পাওয়া যাচ্ছে। একটা মিস করলে, পরের রবিবারটা হাতে থাকবে। খুব সতর্কভাবে এগোতে হবে ওদের।

রসুলপুরে গিয়ে নিবারণ সাঁতরার নাম বলতেই তাকে আরও ভেতর দিকে এগিয়ে যেতে বলা হল। বিকাশ বুঝল রসুলপুরের গঞ্জবাজার এলাকায় নিবারণের ফোনটা নেই। আছে আরও ভেতরে কোথাও। বেশ কিছুটা এগোতে পাওয়া গেল নিবারণের বাড়ি। ছোট একটা পাকা বাড়ি, সামনে মুদিখানা দোকান। ফোনটা দোকানেই আছে। বিকাশের জন্য চেয়ার টেবিল সব ঘরের ভেতর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। নিবারণ মানুষটাকে দেখে বিকাশ বুঝল নিপাট ভালোমানুষ। কলকাতা থেকে গিফ্‌ট আসছে বলে সে সকাল বেলাতেই স্নানটান সেরে, সেজেগুজে বসে আছে। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে বিকাশ বলল, আমাকে অফিসে একটা ফোন করতে হবে, আপনার নম্বর থেকে কল করে, বড়বাবুকে জানিয়ে আপনার হাতে ঘড়িটা পরিয়ে দেব।

ঘর ছেড়ে ওরা এবার দোকানের ভেতর এসে বসল। বিকাশ কন্ট্রোলরুমে ফোন করল। অনঙ্গ জানিয়ে দিল, সব ঠিক আছে। মানে মধুবন্তী সেন পুরো টিম নিয়ে অপেক্ষা করছে।

গিফ্‌ট উপলক্ষ্যে দোকানের বাইরে ছোটখাটো একটা ভিড়।

আজও নিশ্চয় চিন্ময়ী এগারোটায় ফোন করবে...। কিন্তু কাকে ফোন করবে?

বিকাশ বলল, নিবারণবাবু আসুন, আপনার হাতে ঘড়িটা পরিয়ে দিই।

ঘড়ি পরানোর পর মিষ্টিমুখ, সে পর্বও শেষ হল। বিকাশ দেখল, ঘড়িতে ঠিক দশটা চল্লিশ। বলল, নিবারণবাবু আপনি দোকানদারি করুন, আমি বসে বসে অফিসের কাগজপত্র তৈরি করি। আরও দুজনকে গিফ্‌ট পৌঁছে দিতে হবে। এমন সময় ক্রাচে ভর দিয়ে একজন মানুষ দোকনের ভেতর ঢোকে। তাকে দেখেই নিবারণ বলে ওঠে—'অ্যাই মৈনুদ্দিন আজ ফোন হবে না। আজ ফোন বন্ধ।'

কথাটা শুনেই মৈনুদ্দিন পাশে রাখা বেঞ্চে ধপাস করে বসে পড়ে। তার একটা ক্রাচ মাটিতে পড়ে যায়।

বিকাশ বলে ওঠে, 'উনি কে? কাকে ফোন করবেন?'

'মৈনুদ্দিন ফোন করে না, ওর ফোন আসে।'

বিকাশ হঠাৎ পুলিশি হুমকি দেওয়া গলায় বলে ওঠে, না, না, ওকে ফোন করতে দিন। ওর ফোন আসুক।' কোনও বাধা নেই' কথাটা বলেই বিকাশ বুঝতে পারল সুরটা একটু বেশি চড়া হয়ে গেছে। বিকাশ আবার বলে, 'আপনি এমন প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে ফোনের পরিষেবা দিচ্ছেন বলেই তো পুরস্কার পাচ্ছেন। ফোন বন্ধ করলে আর পুরস্কার পাবেন না। এর পরের পুরস্কার টিভি। নিন, ওকে আসতে বলুন। ওর ফোন আসবে তো—উনি ফোন রিসিভ করুন।'

নিবারণ বলল, 'ও ওখানেই বসুক—ফোন এলে ওকে এগিয়ে দেব।'

বিকাশ বলল, 'কী হয়েছিল—উনি পা দুটো কীভাবে খোয়ালেন?'

নিবারণ বলল, 'মৈনুদ্দিন খুব ভালো মানুষ। আমাদেরই গাঁয়ের। কাজ করতে গিয়েছিল মুম্বাই। মুম্বাইতে যে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল তাতে ও খুব জখম হয়। ওর পা দুটো বাদ যায়। দেশে ফিরে আসে বেচারা। এখন ও একটা সাইকেল সারানোর দোকানে কাজ করে।'

বিকাশ একদৃষ্টিতে মৈনুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে থাকল। মুম্বাই বিস্ফোরণে এই মানুষটার পা উড়ে গেছে...। ওর কাছে ফোন আসে প্রতি রবিবার সকাল এগারোটায়। যে ফোন করে সে কল্কির মেম্বার। কল্কি...। টেররিজমের এগেন্সটে কল্কির লড়াই। আর এই মানুষটা টেররিজমের শিকার। দুটো পা হারিয়েছে। হিসেব যেন মিলে যাচ্ছে। তবে কি এ-ও কল্কির মেম্বার?

বিকাশ বলল, 'কে ফোন করে ওকে?'

'ওর সঙ্গে মুম্বাইতে একটা মেয়ের আলাপ হয়। সে-ই টাকাপয়সা দিয়ে ওকে দেশে ফিরিয়ে আনে। খুব ভালো মেয়ে। আমাদের গাঁয়েও এসেছে। সে-ই ফোন করে। মাঝে মাঝে মৈনুদ্দিনকে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্যে করত। এখন মৈনুদ্দিন সাইকেল সারানোর কাজ করার পর আর সাহায্য নেয় না। কিন্তু মেয়েটা প্রতি রবিবার ওকে ফোন করে। ও আমার দোকানে এসে অপেক্ষা করে।

'কী নাম মেয়েটার?'

'চন্দ্রা।'

অনঙ্গ হাসল, চিন্ময়ী, চিন্নি, চন্দ্রা...সব চ-য়ের যোগ।'

ফোন বাজল। পিঠ সোজা করে বসল বিকাশ। ঘড়িতে ঠিক এগারোটা।

নিবারণ ক্রেডেল সুদ্ধ ফোনটা এগিয়ে দিল মৈনুদ্দিনের কাছে। বিকাশ বলল, 'মৈনুদ্দিনভাই ভালো করে কথা বলুন, একদম তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আপনি

যত কথা বলবেন, আমাদের নিবারণবাবু তত বোনাস পয়েন্ট পাবেন, যত বোনাস পয়েন্ট তত দামি পুরস্কার। ফোন এলে নিবারণবাবুর তো কোনও খরচ নেই, ওর সবটাই লাভ।

মৈনুদ্দিন ফোন হাতে নিয়ে রিসিভার তুলল।

'হ্যালো...।'

রবিবার সকাল বেলা এদিকটা গাড়িতে-মানুষে জড়িয়ে মড়িয়ে যায়। ট্যাক্সিটা একদম গেটের সামনে এনে দাঁড় করাল চিন্ময়ী। এই বাড়িটা সে চেনে। ও যেখানে দাঁড়াল সেটা একটা তিনতলা বাড়ি। আপাতত প্যাকিং বাক্স তৈরির কারখানা। কিন্তু এখানে কোনও কালেই প্যাকিং বাক্স তৈরি হয়নি।

এখন সকাল দশটা। বেশ কয়েকটা ফাইল নিয়ে চিন্ময়ী এসে দাঁড়াল বাড়িটার গেটে। আজ বাড়িটার গেটে কোনও সিকিউরিটি গার্ড নেই। আছে স্বয়ং রামশংকর; মুহূর্তে সাদর আমন্ত্রণে তাকে নিয়ে যাওয়া হল বাড়ির ভেতরে। বাড়িটা রামশংকরের।

রামশংকর রাজারহাট নিউ টাউনের এক মস্ত বড় জমি মাফিয়া। জমি জবরদখল করতে সে পারে না হেন কাজ নেই। তাঁর মূল বাড়ি ছত্রিশগড়ে। কিন্তু এখন সে সল্টলেকের বাসিন্দা। সেখানে তার প্রাসাদোপম বাড়ি। আর বাগুইআটির এই বাড়িটা তার জবরদখল করা অনেক সম্পত্তির একটি। খাতায় কলমে দেখানো আছে, এটা একটা প্যাকিং বাক্স তৈরির কারখানা। কিন্তু কস্মিনকালে রামশংকর প্যাকিং বাক্স বানাত না, বানায়ওনি। কিন্তু এই বিরাট বাড়িটা রামশংকর এক ভদ্রলোককে ফাঁকি দিয়ে জবরদখল করে রেখেছে।

বেশ কয়েক বছর আগে এই বাড়ির একটা ঘরে মাস খানেকের জন্য সিমেন্ট রাখতে চেয়েছিল রামশংকর। তখন সে বাগুইআটিতেই একটা মাল্টিস্টোরিড বাড়ি বানাচ্ছিল। বাড়ির মালিক অজিত সরকার প্রথমে রাজি হয়নি। কিন্তু রামশংকরের বিশেষ অনুরোধে মাত্র দু-এক মাসের জন্য নীচের একটা ঘর খুলে দিয়েছিল। বলেছিলেন, কোনও ভাড়া দিতে হবে না; আপনি এত রিকোয়েস্ট করছেন, আমি আপনাকে এটুকু হেল্প করলাম।

সেই বাড়িতে সুচ হয়ে ঢুকে রামশংকর ফাল হয়ে বেরিয়েছে। বাড়িটা ভাড়া নেওয়ার ফল্‌স রিসিট বানিয়ে পুরো বাড়িটাই সে এখন কব্জা করে বসেছে। বাড়ির মালিক আর ত্রিসীমানায় ঢুকতে পারেনি। থানা কোর্ট ঘুরতে ঘুরতে মারা গেছেন। তাঁর বিধবা স্ত্রীও অনেক ঘুরে ব্যর্থ হয়েছেন।

বাগুইআটির সেই বাড়িটায় সকাল দশটার সময় ঢুকে পড়েছে রামশংকর। তাকে বলা হয়েছে সঙ্গে কাউকে যেন না আনে। সিকিউরিটিও সরিয়ে দিতে। তবে এটুকু সে তৈরি হয়েই আসত। সে সবসময় তৈরি হয়েই থাকে।

রামশংকর দশটার আগেই চলে এসেছে। আরও একটু পরে চিন্ময়ী এল। ওর পরনে গাঢ় লাল রঙের সালোয়ার কামিজ। কপালে ছোট একটা টিপ। কাঁধে পাটের ঝোলা ব্যাগে বিস্তর কাগজপত্র, দুটো মোটা মোটা ফাইল। ডানকুনির দিকের একটা মস্ত বড় জমির যাবতীয় কাগজপত্র এতে আছে।

মেয়েটাকে দেখে রামশংকরের কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। কিন্তু চেনা হবে কী করে? রামশংকরকে এই কানেকশনটা করিয়ে দিয়েছে ওরই এক দেশওয়ালি ভাই। সে অবশ্য টোটাল ডিলটা হয়ে যাওয়ার পর টু-পারসেন্ট কমিশন চেয়েছে। সে-ই সঙ্গে আসছে। জমিটা যার এই মেয়েটিই সেই মেয়েটি।

চিন্ময়ীকে বেশ খাতিরদারি করে রামশংকর ভেতরে নিয়ে গেল। বলল, 'সঞ্জয় যে কেন এখানে মিট করতে বলল বুঝলাম না। আমার অফিসে গিয়ে কথা বলতে পারতেন। এসি রুম ছিল, আরামে বসা যেত।'

চিন্ময়ী বলল, 'না, আসলে আমি এখানে একজনের কাছে যাব। একটু দরকার আছে। তাই এদিকটাই আপনার অফিস আছে শুনে বললাম, এখানেই বসব।'

রামশংকর বলল, 'সঞ্জয় আসতে পারবে না বলছে—ওর মেয়ের শরীর ঠিক নেই। জানেন, ওর সঙ্গে আমার পনেরো বছর পরে দেখা হত। ওর মেয়ে আমাকে ফেসবুক থেকে খুঁজে বের করে দিয়েছে। ভালোই হয়েছে।'

চিন্ময়ী হাসল। বলল, 'কাজের কথায় আসি, ডানকুনির এই জমিটা আমার বাবার প্রপার্টি। জমিতে কোনও গোলমাল নেই। একদম ক্লিয়ার ল্যান্ড। কাগজপত্র আপনি ল'ইয়ারদের দেখিয়ে নেবেন। আমি সব সঙ্গে এনেছি। এই জমিটা বাবা আমাকে দিয়েছেন। টোটাল আট বিঘের প্রপার্টি। আমি ছ'বিঘে দিয়ে দেব। দু'বিঘে নিজের জন্য রাখব। আমি এটা বিক্রি করতে চাইছি। কিন্তু আমার কোনও ক্যাশ চাই না। ক্যাশের আমার কোনও প্রয়োজন নেই। তার বদলে বাকি আমার দু'বিঘে জমি ডেভেলপ করে—একটা তিনতলা স্কুল বাড়ি বানিয়ে দিতে হবে। আমি বাচ্চাদের একটা স্কুল করব। ও হ্যাঁ, আর একটা সুইপিং পুল করে দিতে হবে।

প্রস্তাবটা শুনে রামশংকরের চোখমুখ চকচক করে উঠল। বিশেষত তাকে যখন কোনও টাকা দিতে হবে না। রামশংকর বলল, 'এটা নিয়ে কোনও প্রবলেম হবে না। সব হবে।'

চিন্ময়ী সব কাগজপত্তর হস্তান্তর করে দিল। দিয়ে বলল, 'আপনার মোবাইল থেকে একটা ফোন করতে পারি? আমার ফোনটা গড়বড় করছে।'

চিন্ময়ী ফোন করল—খুব সাধারণ কথাবার্তা। একজন মানুষের ভালোমন্দের খোঁজ নিল। সেই সঙ্গে বলে দিল, সে বেশ কিছুদিনের জন্যে বাইরে চলে যাচ্ছে। দু-তিন মাস তো হবেই। ফিরে সে দেখা করে নেবে। ফোনটা কেটে দিয়েও চিন্ময়ী ফোন ছাড়ল না। বলে চলল—হিরেগুলো আমার সঙ্গে আছে, কিন্তু এখন তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে। ভদ্র জীবনযাপন করতে হবে। তুমি যদি রাজি থাকো, আমি তোমার ভাগের হিরে তোমাকে দিয়ে দেব। নইলে সব বেচে দিয়ে গরিব মানুষদের টাকা বিলিয়ে দেব। বাবা আমাকে এই কথা বলে গেছে। তুমি ভাবো কী করবে?'

হিরের কথা শুনে কান খাড়া করে রামশংকর সোজা হয়ে বসল।

ফোনে কথা শেষ করে চিন্ময়ী এগিয়ে এসে রামশংকরের হাতে ফোন দিল। দিয়ে হেসে বলল, 'আমার দাদা—খুব খারাপ পাল্লায় পড়েছে। জুয়া খেলে সব শেষ করেছে, এখন পারিবারিক হিরেগুলো হাতিয়ে নেওয়ার জন্য পিছন পিছন ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি যখন এখানে এলাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে এখানেও হানা দিয়েছে। কী মুশকিল বলুন তো?'

রামশংকর হাঁ করে চিন্ময়ীর কথা শুনছিল। মেয়েটাকে তার এত চেনা লাগছে কেন?

চিন্ময়ী বলল, 'এখন আমাকে আবার আধঘণ্টার জন্যে একটা জায়গায় যেতে হবে। আজ আবার ড্রাইভার আসেনি। খুব ঝামেলা আমার। দাদা এখন আমার পিছু নিয়েছে। হিরেগুলো ব্যাগে নিয়ে আমি ঘুরছি; বাড়িতে রাখার ভরসা পাইনি। আপনি আধঘণ্টার জন্যে আমার হিরেগুলো একটু রেখে দেবেন, আমি কাজ সেরে এসে নিয়ে যাব।'

রামশংকর ঢোঁক গিলল। বলল, 'জরুর!' সে উত্তেজিত, উঃ তার ছেলেবেলার বন্ধু সঞ্জয় তাকে কী কানেকশনটাই না দিয়েছে। সে একে ধরেই মালামাল হয়ে যাবে।

চিন্ময়ী ওর বটুয়া বের করল। খুলল, হাতের তালুতে হিরেগুলো বের করে রামশংকরকে দেখাল। বলল, 'এই দেখুন, প্রায় দশ কোটি টাকার হিরে আছে। আমি আজই এগুলো আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে সরিয়ে দেব। বাড়িতে আর রাখব না। এগুলো আপনি প্লিজ একটু রাখুন।

রামশংকর বটুয়া ভরা হিরেগুলো নিয়ে বুক পকেটে রাখল।

চিন্ময়ী বলল, 'আমার ফিরতে আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট হবে। আপনার ফোন নম্বর আমার কাছে আছে। আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব। আর হ্যাঁ, আমার দাদা কিন্তু যে-কোনও সময় এসে হামলা চালাতে পারে। মাতাল আর জুয়াড়ি মানুষ। প্রথমে ভয় দেখাবেন। বলবেন—গুলি চালিয়ে দেব। ও

আপনাকেও ভয় দেখাবে—বলবে আমি পুলিশের লোক। ওর কথায় ভুলবেন না যেন। তেমন বুঝলে একটা আধটা গুলি ছুড়ে দেবেন। দেখবেন যেন গায়ে না লাগে। ও পালিয়ে যাবে। ও গুলিকেই ভয় পায়, আমিও তাই করি। এই দেখুন আমাকে ব্যাগে করে রিভলবার নিয়ে ঘুরতে হয়।'

চিন্ময়ী ব্যাগ থেকে রিভলবার বের করে রামশংকরের নাকের ডগায় ঘোরালো। বলল, 'আমি তাহলে আসি। ওকে কিন্তু এখানে ঢুকতে দেবেন না। তাহলে ও ঠিক হিরেগুলো নিয়ে পালিয়ে যাবে।'

রামশংকর বলল, 'আরে ম্যাডাম, কোনও ভয় নেই—আমার কাছেও রিভলবার আছে। রামশংকরের কাছ থেকে হিরে নিয়ে যাবে এমন ক্ষমতা ওর নেই।'

কথা শেষ করে চিন্ময়ী হাসল। বলল, 'যতই হোক, দাদা তো—বড় ভালোবাসি। ও যদি ভালোমানুষ হত, তবে এই আটটা হিরে কেন, আমার ভাগের আটটা হিরেও ওকে দিয়ে দিতাম।'

রামশংকর বলল, 'কোনও চিন্তা করবেন না ম্যাডাম, আপনি নিশ্চিন্তে ঘুরে আসুন।'

চিন্ময়ী চুল ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

চিন্ময়ী চলে যেতেই রামশংকর কোমর থেকে রিভলবার বের করে টেবিলে রাখল। তারপর বটুয়া খুলে তালুতে হিরেগুলো নিয়ে দেখতে লাগল। আটখানা হিরে। তার দু-চোখ ঝলসে যাচ্ছে। অন্য সময় হলে হিরেগুলো নিয়ে এখুনি রামশংকর ভেগে যেত।

কিন্তু আজ সে হিরেগুলো নিয়ে ভাগবে না। কারণ ডানকুনির এই জমিটার দাম অনেক। আগে জমিটা ম্যানেজ করুক, তারপর এই হিরেগুলোও সে ঠিক কব্জা করতে পারবে।

লোকেশনটা ট্রেস করা গেছে। এই কলকাতার বাগুইআটির দিকের একটা বাড়িতে। ট্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় জিরো টাইমে বাড়িটাকে ঘিরে ফেলল মধুবন্তী আর দুর্দান্ত সাদা পোশাকের পুলিশ। ওদের সঙ্গে ফুল লোডেড রিভলবার। বাইরে থেকে গেট বন্ধ। বাইরে একটা গাড়িতে মধুবন্তী একজনকে নিয়ে বসে থাকল। আরও কিছুক্ষণ গড়াল। মধুবন্তী নিশ্চিত এখানেই চিন্ময়ীকে পাওয়া যাবে। এমনও হতে পারে এটা কল্কিদের বড় কোনও আস্তানা। আজ চিন্ময়ীকে ধরলে হয়তো ১৪ ফেব্রুয়ারির ভ্যালেন্টাইন ডে-র বড় কোনও নাশকতা রোধ করা যাবে।

মধুবন্তী তীক্ষ্ণ চোখ বাড়ির গেটটার দিকে তাকিয়ে। গেটটা খুলে গেল। মধুবন্তী দুজনকে নিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর। মধুবন্তীকে পিছনে রেখে ততক্ষণে তিনজন সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে উঠতে শুরু করেছে। প্রথমজন দোতলায় উঠতেই রামশংকর হুংকার দিল—ভাগো হিয়াঁসে—নেহি তো গোলি কর দেগা।'

অনঙ্গ দেব বলল,—'আমরা পুলিশের লোক—সিআইডি—সারেন্ডার করো।'

'ভাগ শালা হিয়াঁসে—পোলিশ—গোলি খায়গা? ভাগ!'

একজন দড়াম করে লাথি মেরে দরজা খুলে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে গুলি ছুড়ল রামশংকর। সঙ্গে সঙ্গে পালটা গুলি ছুটল। সিআইডি অফিসার দেবাশিসের টিপ অব্যর্থ—মাটিতে লুটিয়ে পড়ল রামশংকর।

এক গুলিতেই খেল শেষ!

ওরা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চিন্ময়ীকে সারেন্ডার করতে বলল। মধুবন্তীর বিশ্বাস এই বাড়িতে নিশ্চিয়ই চিন্ময়ী আছে। নইলে এভাবে গুলি চলত না। কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজি করেও কাউকে পাওয়া গেল না। শুধু টেবিলের ওপর আটটা হিরে কাটিং করা কাচের টুকরো। আর ফাইল ভরা আজেবাজে কাগজ।

ওরা অবাক হয়ে গেল!

সবকিছু খতিয়ে দেখতে দেখতে মধুবন্তীর মনে হল, সে কোনও ট্র্যাপে পড়েছে। পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। বেফালতু একটা লোকের প্রাণ গেল তাদের হাতে। এতক্ষণে মিডিয়ার কাছে খবর চলে গেছে। মিডিয়া এবার তাদের ছিঁড়ে খাবে। সে কোন টেররিজমের কথা বলবে?

হঠাৎই টিভি খুলেছিলেন মালতী সরকার। একা মানুষ। টিভিই ওর সঙ্গী। নিজের মতো করে চলে যায়। হালকা সাউন্ড দেওয়া থাকে। কিন্তু আজ—আরে কী আশ্চর্য! টিভিতে যে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে সেটা যে তাঁর বাড়ি। তাঁর বাগুইআটির বাড়ি। হ্যাঁ- হ্যাঁ-তাই তো! এই বাড়িটাই তো ওই বদমাইশ রামশংকরটা কব্জা করে রেখেছে মিথ্যে ভাড়ার বিল বানিয়ে।

আরে, রামশংকর খুন হয়েছে এই বাড়িতে। এবার নিশ্চয়ই বাড়িটা দখলমুক্ত হবে। ইস, এসময় যদি তাঁর স্বামী বেঁচে থাকতেন, কত খুশি হত!

তখনই মালতীর চিন্ময়ীর কথা মনে পড়ে যায়। চিন্ময়ী থাকলেও খুব খুশি হত। মেয়েটা এই বাড়িটার জন্যে কম জায়গায় দৌড়োয়নি। তার সঙ্গে কতদিন কোর্টে গেছে। থানা, পুলিশ করেছে। একবার তো ওই রামশংকরের অফিসে গিয়ে দেখা করে কথাও বলেছিল। কোনও কিছু হয়নি।

অনেকদিন পরে এমন আনন্দের দিনে...বার বার চিন্ময়ীর কথা মনে পড়ছিল তাঁর।

মেয়েটা হঠাৎ যেন উবে গেল। ওর এক বন্ধু খুন হল। তারপর মেয়েটা সেই যে ল'ইয়ারের বাড়ি গেল আর ফিরল না। দু-দুবার পুলিশ এসে ওর খোঁজ করে গেছে। মালতী সরকার বলেছেন, চিন্ময়ী তার বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকত, তার বেশি কিছু সে জানে না। হ্যাঁ, তারা দুজনেই সরকার, কিন্তু কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই।

দুপুরের দিকে মধুবন্তীর কাছে সব ইনফরমেশনই চলে এসেছে—এই বাড়ির মালিক মালতী সরকার। বিধবা বয়স্কা মহিলা। একটা গার্লস স্কুলের রিটায়ার্ড হেডমিস্ট্রেস। খুন হয়ে যাওয়া রামশংকর তাঁর বাড়িটা জবরদখল করে রেখেছিল। মালতীর পেয়িং গেস্ট ছিল চিন্ময়ী সরকার। চিন্ময়ী পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে, পুলিশকে দিয়েই রামশংকরকে আজ শেষ করাল। আর মধুবন্তীও অহেতুক একটা এনকাউন্টারের কেসে ফেঁসে গেল। এখানে কোনও টেররিজমের তত্ত্ব মধুবন্তী খাঁড়া করতে পারছে না। চেষ্টা করছে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করছে না। এক ঢিলে চিন্ময়ী সরকার দু-দুটো পাখি মেরে গেল! মেয়েটার বুদ্ধির তারিফ না করে মধুবন্তী পারছে না।

ওদিকে চিন্ময়ী তখন কল্কির তিনজন অদৃশ্য সদস্যাকে ইন্টারনেটে মেসেজ লিখল...কোড ল্যাঙ্গুয়েজে। তাতে লেখা ছিল—টেররিজমের বিরুদ্ধে আমরা লড়ব। কিন্তু সাধারণ মানুষের রক্তপাত চাই না! ১৪ ফেব্রুয়ারি অন্যভাবে ভাবতে হবে আমাদের।

কল্কির অদৃশ্য সদস্যর দুজন চিন্ময়ীর এ যুক্তি মানতে পারছে না। দুজনের মতামত ঃ টেররিজমকে থামাতে গেলে সাধারণ মানুষের রক্তপাত হতেই পারে। এর জন্যে এত দুঃখ পেলে চলবে না।

চিন্ময়ীর মনে হচ্ছে তার রাস্তা ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে...!

রামশংকর খুন হলে তার দুঃখ নেই। কিংবা একজন টেররিস্টকে সে নিজের হাতেই মারতে চায়। কিন্তু কোনওভাবে কোনও নিরাপরাধ, সাধারণ মানুষের রক্ত দেখতে সে পারবে না।

চিন্ময়ী ব্যাগে রাখা খেলনা রিভলবারটা রাস্তার ধারে একটা গরিব বাচ্চার হাতে দিয়ে শিয়ালদা স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল।

১৪ ফেব্রুয়ারি—তাদের অন্যভাবে ভাবতে হবে।

না। গল্প শেষ হল না। পরের সংখ্যায় লিখবেন অন্য লেখক।

শুভমানস ঘোষ

বদ্ধপাগল

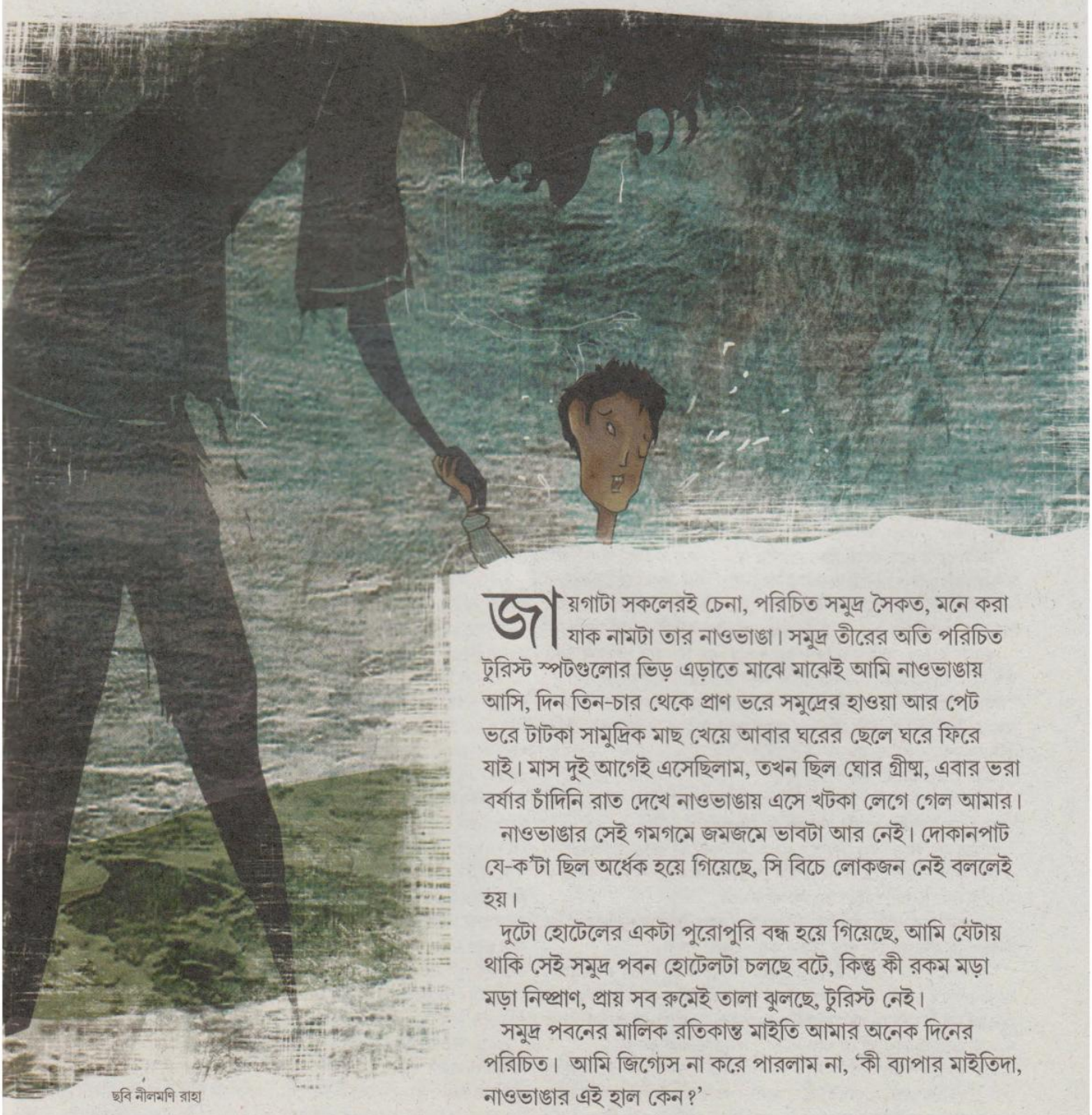

ছবি নীলমণি রাহা

জায়গাটা সকলেরই চেনা, পরিচিত সমুদ্র সৈকত, মনে করা যাক নামটা তার নাওভাঙা। সমুদ্র তীরের অতি পরিচিত টুরিস্ট স্পটগুলোর ভিড় এড়াতে মাঝে মাঝেই আমি নাওভাঙায় আসি, দিন তিন-চার থেকে প্রাণ ভরে সমুদ্রের হাওয়া আর পেট ভরে টাটকা সামুদ্রিক মাছ খেয়ে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। মাস দুই আগেই এসেছিলাম, তখন ছিল ঘোর গ্রীষ্ম, এবার ভরা বর্ষার চাঁদিনি রাত দেখে নাওভাঙায় এসে খটকা লেগে গেল আমার।

নাওভাঙার সেই গমগমে জমজমে ভাবটা আর নেই। দোকানপাট যে-ক'টা ছিল অর্ধেক হয়ে গিয়েছে, সি বিচে লোকজন নেই বললেই হয়।

দুটো হোটেলের একটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আমি যেটায় থাকি সেই সমুদ্র পবন হোটেলটা চলছে বটে, কিন্তু কী রকম মড়া মড়া নিষ্প্রাণ, প্রায় সব রুমেই তালা ঝুলছে, টুরিস্ট নেই।

সমুদ্র পবনের মালিক রতিকান্ত মাইতি আমার অনেক দিনের পরিচিত। আমি জিগ্যেস না করে পারলাম না, 'কী ব্যাপার মাইতিদা, নাওভাঙার এই হাল কেন?'

মাইতিদা ভয়ার্ত চোখে সমুদ্রের দিকে এক ঝলক চেয়ে চাপা স্বরে বললেন, 'নাওভাঙার বদনাম হয়ে গিয়েছে লাহিড়ীদা, লোকে আর ভয়েই আসে না। এবার বোধ হয় না-খেয়েই মরতে হবে। মাস্টারভূতে ধরেছে আমাদের নাওভাঙাকে।

'মাস্টারভূত!'

'হ্যাঁ লাহিড়ীদা। আপনি তো দেখেছিলেন আমাদের মাস্টারকে। মাস্টারপাগলকে।'

আমার আগের টুরের কথা মনে পড়ে গেল। নাওভাঙায় এসে মাস্টার পাগলের দেখা পেয়েছিলাম সেবার। যখন সুস্থ ছিল তখন মাস্টারপাগল মেদিনীপুরের কোনও একটা স্কুলে মাস্টারি করত, হঠাৎ কী কারণে মাথাটা খারাপ হয়ে যায় তার, তারপর থেকে নিজের বাড়ি ছেড়ে, নিজের গ্রাম ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে নাওভাঙায় এসে পড়ে।

মাস্টারপাগল পাগল হলেও নোংরা কালিঝুলি মাখা পাগল নয়, প্যান্ট-শার্ট পরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গুছিয়ে কথা বলা ভদ্র দেখতে, চট করে দেখে বোঝার উপায় নেই পাগল। সমুদ্রের ধারে মাইতিদার ভাই সুবলের ঝুপড়ি দোকানে বসে সমুদ্র দেখতে দেখতে ডাব খাচ্ছিলাম, সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল মাস্টারপাগল। আমার দিকে স্পষ্ট চোখে চেয়ে মার্জিত ভঙ্গিতে বলেছিল, 'ডোন্ট মাইন্ড স্যার, একটা কথা বলব?' 'আপনি আমাকে একটা ডাব খাওয়াবেন প্লিজ? আই অ্যাম ভেরি ভেরি থার্স্টি স্যার।'

এবার আমার সন্দেহ জেগেছিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার সন্দেহ মিটিয়ে দিয়ে ডাবওয়ালা 'যা ভাগ' বলে মাস্টারপাগলকে তাড়া লাগিয়েছিল, আমার দিকে চেয়ে লজ্জিত হেসে বলেছিল, 'পাগল, বুঝলেন কিনা?'

পাগল! আমি চমকে উঠে ভালো করে দেখেছিলাম মাস্টারপাগলকে। ডাবওয়ালার তাড়ায় সে কিছু দূরে গিয়ে চড়া রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে জুলজুল করে চেয়ে আছে ডাবটার দিকে। সে দৃষ্টিতে কী যে তৃষ্ণা, কী যে আকুলতা, বলে বোঝাতে পারব না। আমার দয়া হল, ডাবওয়ালার কাছ থেকে একটা ডাব কিনে ডাক দিলাম, 'আসুন ভাই, খান।'

আমার আহ্বানে মাস্টারপাগল সত্যিকারের পাগলের মতো ছুটে এল, তার পর আমার হাত থেকে ডাবটা ছোঁ মেরে কেড়ে ঢক ঢক করে সমস্ত জলটা খেয়ে ফেলল।

ডাবটা খেয়ে ছুড়ে ফেলে মাস্টারপাগল আমার দিকে কৃতজ্ঞতাভরা চোখে তাকাল, তারপর মাথা নেড়ে 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার' বলে গটগট করে হেঁটে টুরিস্টদের ভিড়ে মিশে গেল। রাতে সুবলের দোকানে খেতে গিয়ে আবার দেখা হল মাস্টারপাগলের সঙ্গে। সেই রাতের কথা কখনও ভুলব না, জঘন্য কাণ্ড।

'হুঁ মনে আছে।' আমি মাইতিদার কথায় সায় দিয়ে সবিস্ময়ে বললাম, 'কিন্তু ভূত হয়ে গিয়েছে মানে? মাস্টারপাগল কি মরে গিয়েছে মাইতিদা?'

'মরে গিয়েছে কী বলছেন?' মাইতিদা দুঃখের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'মেরে ফেলেছে। আপনি তো দেখেছেন জেলেদের ক'টা বদমাইশ ছেলে কীভাবে পেছনে লাগত তার?'

আমি আহত হলাম, 'সে কী!'

'তবে আর বলছি কী! মানুষ কি এখন আর মানুষ আছে? পা পচে গ্যাংগ্রিন হয়ে মরেছে বেচারা। আপনি তো জানেন ঘটনাটা?'

আমার মনে পড়ে গেল সেবার সুবলের দোকানে সেই রাতে ছেলেগুলোকে দেখেছিলাম। লোকাল ছেলে সব, স্থানীয় জেলেপাড়ায় থাকে, পনেরো-ষোলো-সতেরো বছর বয়েস, চ্যাংড়া ছোকরা যাকে বলে।

দোকানের এককোণে মাস্টারপাগল বসেছিল, কিন্তু কিছুতেই শান্তিতে বসতে দিচ্ছিল না, ক্রমাগত ঢিল ছুড়ে বিরক্ত করে যাচ্ছিল তাকে।

নিরীহ পাগলের ওপর উপদ্রব ভালো লাগছিল না, বারণ করেছিলাম ছেলেগুলোকে। কিন্তু ছেলেগুলো বড্ড বেয়াড়া। আমাদের কারও কথাতেই কান দিচ্ছিল না। সমানে জ্বালিয়ে যাচ্ছিল মাস্টারপাগলকে। এই করতে করতে মাত্রা ছাড়িয়ে ছেলেগুলো যে কাণ্ড ঘটাল, এখনও ভাবলে কষ্ট হয়।

হঠাৎ মাস্টারপাগল আর্তনাদ করে উঠল। আমরা খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি পৈশাচিক কাণ্ড, আধলা ইট ছুড়ে মাস্টারপাগলের ডান পা-টা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে ছেলেগুলো। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে, মাস্টারপাগল শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদছে।

দেখে মাথাটা এত গরম হয়ে গেল, ছেলেগুলোকে ধরবার জন্য ছুটলাম, 'মেরেই ফেলব শয়তানগুলোকে' বলে আমাদের সঙ্গে গেল সুবল। কিন্তু ঘটনাটা ঘটিয়ে দিয়েই ছেলেগুলো পালিয়েছিল, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের হদিশ করতে পারলাম না।

ফিরে এসে দেখলাম কান্না থেমেছে পাগলের। সুবলের বউ চুন লাগিয়ে দিয়েছে ক্ষতর ওপরে। রক্ত বন্ধ হলেও পা-টা দুহাত দিয়ে আগলে রেখে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে।

তার অসহায় করুণ চোখ আর জলে ভেজা গাল দেখে মনটা ব্যথায় ভরে গেল আমার। সুবলকে একটা একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বললাম, 'বেচারাকে মাংস-ভাত খাইয়ে দাও। খুব কষ্ট পেয়েছে।'

আমার কথা শুনে কষ্ট ভুলে গেল পাগল, আনন্দে চকচক করে উঠল তার চোখ, আমাকে বারবার 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার' বলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জুড়ল, 'ইউ আর ভেরি ভেরি গুডম্যান। আমি আপনার কথা চিরকাল মনে রাখব স্যার।'

ডায়লগ দেখে কে বলবে পাগল? আমি হেসে ফেলেছিলাম। পরের দিন ভোরে উঠে ফিরে আসি নাওভাঙা থেকে। এখন শুনছি পায়ের ওই ক্ষতই বিষিয়ে মাস্টারপাগল মারা যায়।

'মাস্টারপাগল কি ভূত হয়ে আজকাল এদিকে ঘুরছে?' একটু চুপ করে থেকে আমি মাইতিদার কাছে আসল কথাটা জানতে চাইলাম।

'ঠিক ধরেছেন লাহিড়ীদা।' মাইতিদা ঘাড় দুলিয়ে বললেন, 'অনেকেই দেখেছে। দিনের বেলা কিছু না, কিন্তু রাত হলেই খেল শুরু হয়ে যায় তার। সারারাত সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়ায় আর বাচ্চাদের মতো ''খেতে দে, খেতে দে'' বলে কাঁদে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, লম্বাটে দাঁড়ি, তালগাছের মতো হাইট।'

'তালগাছের মতো হাইট! কী বলছেন!'

'ঠিকই বলছি।' মাইতিদা চোখ বড় বড় করে বলতে থাকলেন, 'এই তো দিন পনেরো আগে জেলেদের কয়েকটা ছেলে রাতের দিকে মোবাইল ফোনে গান চালিয়ে সি বিচে মদ খেয়ে পড়ে ছিল, হঠাৎ দেখে সামনে ওই বিকট চেহারা, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, ''খেতে দে রে, খেতে দে।''

যে ছোকরাগুলো তাকে মেরেছিল তাদের দলে দুজন ছিল, তাদের একজন মাস্টারপাগলকে দেখে ভয়েই হার্টফেল করে জলে ডুবে মরে। অন্যটা বেঁচে ফিরলেও মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তার, একেবারে বদ্ধ উন্মাদ।

ওই ঘটনাটার কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়েছে, লোকে আর ভয়েই ঘেঁষছে না এদিকে। আপনার কাছে ভালো ওঝা-টোঝা আছে লাহিড়ীদা?'

'ওঝা? ভালো লোককে ধরেছেন!' আমি বললাম, 'ওসব তো আপনাদেরই জানার কথা।'

'জানলে কী হবে? পারলে তো?' বলে মাইতিদা ঝেড়ে কাশলেন, 'এর মধ্যে দু-দুটো ওঝা দিয়ে সি বিচ ঝাড়িয়েছি, কিন্তু মাস্টারকে কবজা করা যাচ্ছে না। কালও হোটেল থেকেই মাস্টারের কান্না শুনেছি। এখনও খিদে মেটেনি তার। যারা তাকে মেরেছিল তাদের সব ক'টাকে না খাওয়া পর্যন্ত থামবে বলে মনে হয় না। এই দেখুন আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।'

ফতুয়ার হাতা তুলে মাইতিদা হাতটা দেখিয়ে কাতর গলায় বললেন, 'আছে ভালো ওঝা লাহিড়ীদা? মাস্টারভূতের জন্য এত সুন্দর টুরিস্ট স্পটটা নষ্ট হয়ে যাবে—এটা একটা কথা হল?'

হুঁ, এটা একটা চিন্তার বিষয় বটে। আমি 'ঠিকই তো' বলে মাথা নেড়ে বিচের দিকে তাকালাম। সত্যিই অপূর্ব সি বিচ। ছোট একটা নদী এসে পড়েছে সমুদ্রে, জোয়ারের সময় তার জল বাড়ে, লাল কাঁকড়ায় রক্তলাল সৈকত একটু একটু করে ডুবে যেতে থাকে। কাঁকড়াগুলো মাটির ঢেলা দিয়ে গর্তের মুখ এয়ার টাইট করে সুট সুট করে গর্তে ঢুকে পড়ে—ভারী মজা লাগে দেখতে। এসব দেখতেই তো দু'দিন অন্তর ছুটে আসি নাওভাঙায়। সব বন্ধ হয়ে যাবে? নাওভাঙা পরিত্যক্ত টুরিস্ট স্পটে পরিণত হবে?

ওঝা-টোঝার মতলব ছেড়ে নিজেই একটা চেষ্টা করে দেখব নাকি? মাস্টারপাগলের ভূত যদি না থাকে, সবটাই চোখে দেখার বা কানে শোনার ভুল হয়ে থাকে, তা হলে তো মিটেই গেল। আর যদি সত্যিই থাকে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও আমাকে অন্তত কিছু করবে না। আমি ওকে ডাব খাইয়েছিলাম,

মাংস-ভাত খাইয়েছিলাম। ভূত হলেও কৃতজ্ঞতা তো আছে একটা।

কিন্তু কথাটা বলতেই 'সর্বনাশ' বলে চোখ ঠেলে এল মাইতিদার, 'আপনি কী করবেন? শুনলেন তো মাস্টারভূত সোজা ভূত নয়। একেবারে জানে মেরে দেবে আপনাকে।'

'অসম্ভব।' আমি আত্মবিশ্বাসী গলায় বললাম, 'আমি জেলেদের ছেলে নই, বুঝলেন?'

মাইতিদা দেখছিলেন আমাকে, চোখে ভয় ও সংশয়, শুধোলেন, 'আপনি ঠিক কী করবেন বলুন তো?'

উত্তর দিতে যাব, আচমকা সোঁ সোঁ করে বৃষ্টি এসে গেল। বৃষ্টিতে সি বিচ ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। তীরের সুবলের দোকানটা অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে, কিন্তু তাতে একটাও লোক নেই।

ভারী অস্বাভাবিক ও রহস্যময় লাগছে নাওভাঙার সমুদ্র সৈকত। এত সুন্দর টুরিস্ট স্পটের কী শোচনীয় অবস্থা! নাহ্, একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

আমার কেমন জেদ এসে গেল, বললাম, 'কী করব, আমি তো রাতে আছি, নিজের চোখেই দেখবেন।'

দুই

বর্ষাকালের বৃষ্টি, থেমে থেমে সন্ধে পর্যন্ত টেনে দিল। তারপরে হঠাৎ করেই একদম চুপ মেরে গেল, আর সাড়াশব্দ দিল না। সূর্য পাটে বসার আগেই ঝুপঝুপ করে দোকানপাটের ঝাঁপ পড়ে যাচ্ছিল। দিনের আলো পাকাপাকিভাবে চোখ বোজার আগেই সমুদ্র সৈকত পুরোপুরি ভূতুড়ে আকার ধারণ করল। দেখলে অতি বড় সাহসীরও বুক কেঁপে ওঠে।

কিন্তু ভয় করলেই ভয় মাথায় চড়ে যাবে, ভয়কে স্রেফ তুড়ি মেরে উড়িয়ে মাইতিদার নিষেধ সত্ত্বেও আমি বেরিয়ে পড়লাম। যে করেই হোক নাওভাঙাকে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর প্রতিজ্ঞায় বুক বেঁধে হাঁটতে হাঁটতে মোহনার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম।

ঝুপসি অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে চারপাশ, তার মধ্যে কলকলরবে জোয়ার আসতে শুরু করেছে। বর্ষার ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার লম্বা একটা ছায়া আমার পায়ের কাছে চলে এসেছে খেয়াল করতে পারিনি।

কতক্ষণ চেয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ পায়ে সুড়সুড়ি লাগতে চমকে গেলাম। সাপ বা বিছে মনে করে লাফিয়ে সরে এসে নীচে তাকিয়ে দেখি, নদীর জল বাড়তে বাড়তে এগিয়ে এসে আমার পায়ের পাতা ছুঁয়ে ফেলেছে। নদীর ওপারে সমুদ্রও ফুঁসে উঠেছে, তোলপাড় করছে।

নাহ্, এখানে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়, ভূতে না মারুক, জোয়ারের জলেই ডুবে মরতে হবে, এই ভেবে ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক পা গিয়েছি, হঠাৎ আমার পিঠের কাছে কে যেন ফ্যাসফেসে স্বরে হাঁক পাড়ল, 'অ্যাই কই যাস? আমারে খেতে দে।'

আমি বিকটভাবে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে যা দেখলাম, বুঝলাম যেটাকে জ্যোৎস্না ভেবেছিলাম, সেটা আসলে একটা মানুষেরই ছায়া, মাইতিদা যার হাইট তালগাছের মতো বলেছিলেন। নিমেষে আমার সাহসের সব স্টক তলানিতে, বুক ধকধক করে উঠল, চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কে? কে তুমি?'

লোকটা কয়েক পা এগিয়ে এল, পিঠের দিকে চাঁদ থাকায় তার মুখটা বোঝা যাচ্ছে না। আমার মুখটা ভালো করে দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'আরিব্বাস, মিস্টার গুডম্যান!'

নাহ্, মাইতিদারা নেহাত ভুল দেখেননি, ভুল শোনেননি দেখছি। গা-টা শিরশির করে উঠলেও ভেতরে ভেতরে স্বস্তির নিশ্বাসও ছাড়লাম। আমাকে ঠিক চিনেছে মাস্টার। তাড়াতাড়ি বললাম, 'তু-তু-তুমি-মানে আপনি মাস্টারভূত?'

মাস্টারভূত 'রাইট' বলে ঘাড় নেড়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, 'ইউ আর আ গুডম্যান, ভেরি ভেরি গুডম্যান! আপনি আমাকে ডাব খাইয়েছিলেন।'

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, ভূতদেরও কৃতজ্ঞতাবোধ থাকে। মাইতিদা বৃথাই ভয় দেখাচ্ছিলেন। উল্লসিতভাবে বললাম, 'যাক, চিনতে পেরেছেন তা হলে?'

'চিনব না? কী যে বলেন!' মাস্টারভূত একটু যেন বিরক্ত হল, 'আমি যখন বেঁচেছিলাম তখন স্কুলে মাস্টারি করতাম মশাই। এত সহজে ভুলে যাওয়ার বান্দা আমি নই, কী বুঝলেন?'

মরে গিয়ে পাগলামি রোগ সেরে গিয়েছে মাস্টারভূতের, অতীতের কথা সব মনে পড়ে গিয়েছে তার। মনে খুশি জাগল আমার। বললাম, 'বুঝলাম, আপনি পুরোপুরি নর্মাল হয়ে গিয়েছেন!'

'তার মানে?' মাস্টার বুঝল উলটো, ফোঁস করে উঠল, 'আপনি কি বলতে চান আমি আগে অ্যাবনর্মাল ছিলাম?'

'না না। সে কী?' আমি বিব্রতভাবে জিভ কাটলাম।

'হুঁ, এসব বলবেন না, ঠিক আছে? মাস্টারভূত গজগজ করে উঠল, 'পাগল আসলে আপনারা। কোথাও কিছু নেই, মরেই গিয়েছি, তার বেশি তো কিছু করিনি, তার জন্য আমাকে দেখে পট করে আপনাদেরই বা মরে যাওয়ার কী হল? ভূত হলেও আমি কাউকে ভয় দেখানো পছন্দ করি না হ্যাঁ।'

'ও' বলে আমি আমার অজ্ঞতা স্বীকার করে জিগ্যেস করলাম, 'জেলেদের ছেলেদের কথা বলছেন?'

'তবে আর কাদের?' মাস্টারভূত খ্যাঁক করে উঠল।

'বেশ করেছেন মেরেছেন।' আমি মাস্টারভূতকে আশ্বস্ত করতে চাইলাম, 'ওরাই তো আপনাকে মেরেছিল, ঠিক হয়েছে। উচিত শিক্ষা হয়েছে তাদের।'

'এ কী বলছেন আপনি, ছি!' মাস্টারভূত আবারও উলটো বুঝল, একেবারে ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল, 'আপনি আমায় কী ভেবেছেন বলুন তো? ডাকাত বা গুণ্ডা যে বদলা নিয়ে বেড়াব?'

কী বললাম, কী বুঝল! ততক্ষণে জোয়ারের জল আমার পায়ের গোড়ালি বেয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে, আর সময় নেই, এবার পালাতেই হবে। বললাম, 'আমি এবার যাই, কেমন?'

সঙ্গে সঙ্গে 'দাঁড়ান' বলে হিম কনকনে হাত দিয়ে খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরল মাস্টার। হিসহিস করে বলল, 'যাওয়ার আগে শুনে যান, আমি কিন্তু জেলেদের ছেলেদের বিরক্তও করিনি, ভয়ও দেখাইনি, শুধু খেতে চেয়েছিলাম তাদের কাছে। কী বলুন তো?'

'কী-ই-ই?'

'মাংস-ভাত। আপনি আমাকে মাংস-ভাত খাওয়ার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সুবল টাকাটা মেরে দেয়। আমার আর মাংস-ভাত খাওয়া হয়নি। কিন্তু তার জন্য ভয়ে জেলেদের ছেলেগুলো চোখ উলটে পড়লে আমি কী করব?'

হাঁটু ধরে নিয়েছে জল, কলকল করে উঠে আসছে ওপরে, আরও ওপরে, আমি ব্যস্তভাবে 'ঠিকই তো' বলে মিনতি করলাম, এবার হাতটা ছাড়ুন প্লিজ!'

আমার কথা কানেই গেল না মাস্টারভূতের, বিকট গর্জন ছেড়ে বলতে থাকল, 'আমাকে কোন আক্কেলে আপনি খুনি বানিয়ে দিলেন, অ্যাঁ? জানেন না, হিংসার দ্বারা হিংসা জয় করা যায় না, ভালোবাসা দিয়েই হিংসাকে জয় করতে হয়?'

টিপিক্যাল মাস্টারি ডায়লগ। মাথা ঠিক হতেই আবার পুরোদমে মাস্টারি-সত্তা ফিরে এসেছে লোকটার। আমার সমস্ত আত্মবিশ্বাস জলে গেল, 'একদম ঠিক' বলে আবারও তার কথা চোখ-কান বুজে মেনে নিয়ে প্রাণপণে হাতটা ছাড়াতে চাইলাম। পারলাম না। মাস্টারভূত চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকল, 'নাহ্, যা ভেবেছিলাম আপনি তা নন। আপনি গুডম্যান নন, আগলি ম্যান, জঘন্য লোক। মাংস-ভাতের লোভ দেখিয়েছিলেন, তার জন্যই আবার ভূত হয়ে আসতে হয়েছে আমাকে। আপনিই দায়ী, আসল কালপ্রিট। আপনাকে আমি ছাড়ব না।'

আমার প্রাণ উড়ে গেল, চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কী? কী করবেন আপনি?'

'ইঁদুরের মতো ডুবিয়ে মারব। আমি ডাকাত? আমি গুণ্ডা? আমি খুনি? আমি পাগল? বলেই চলেছেন, বলেই চলেছেন? এতবড় আস্পর্ধা আপনার!'

ভয়ে-আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলাম। ভেসে গেল আমার গুডম্যানের সব অভিমান, একার শক্তিতে টুরিস্ট স্পট বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা।

অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি জোয়ারের জল বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে বুক ছাড়াল, গলা ছুঁল, তারপর মুখ, তার থেকে নাক, আটকে আসছে শ্বাস, ছটফট করছি। ছটফট করতে করতে হঠাৎ আমার মনে হল, ভেবেছিলাম মরে গিয়ে মাস্টারের মাথা সেরে গিয়েছে—ঘণ্টা! ভালোবাসা দিয়ে হিংসাকে জয় করার এই ছিরি! দয়া করে ডাব খাওয়ানোর এই প্রতিদান! ভূতের এই কিনা কৃতজ্ঞতা? পাগল! বদ্ধপাগল!

জগুমামার রহস্য অভিযান

কাহিনি চিত্রনাট্য সংলাপ ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

সোনার সাগর রহস্য

ছবি জুরান নাথ বর্ণসংস্থাপন মানস চক্রবর্তী

বেশ। ইকবাল, তোমার কথা ধরে নাও বিশ্বাস করলাম। একটা কথা বলো তো, দেখলাম এখানে তোমরা প্রায় তিরিশজন লোক আছ। তোমাদের কাজটা কী?
এই পুরো এরিয়া হাইসিকিউরিটি জোন।
একটা মাছিও যাতে গলে ঢুকতে না পারে সেটা কনফার্ম করাই আমাদের কাজ স্যার।
তেমন ঘটনা কি আগে ঘটেছে? মানে, কোনও লোক—
হ্যাঁ স্যার।
শুনেছি, মাস ছ'য়েক আগে, কাউকে না জানিয়ে একজন ঢুকে পড়েছিল।... পরে জেনেছি কোনও কাগজের লোক।
তারপর?
কী হল? চুপ কেন? কী হয়েছিল তার?
?
ত্-তাকে স্যার গুলি করা হয়েছিল। বডি অনেক দূর সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।
মাই গড্! সো ডেঞ্জারাস সিকিওরিটি।
!

হ্যাঁ...এবার মনে পড়েছে। ঠিক। কাগজে ছোট করে বেরিয়েছিল। দিঘায় গিয়ে রিপোর্টার নিখোঁজ।
?
ঠিক আছে। তোমায় যেতে দিচ্ছি। তবে একটা কথা বলে দিই, যদি তোমার জীবনের মায়া থাকে—
আজকের ঘটনাটা কাউকে বোলো না। আমরা মোটেই সোজা লোক নই। খবরটা ঠিক পেয়ে যাব। তারপর তোমার...ওই রিপোর্টারের মতো...বুঝলে?
জি স্যার।
সেলাম স্যার!

টুকলু, সব গুলিয়ে গেল রে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের টাকায় মহান্তি রিসার্চ করছে। অবশ্যই খুব কনফিডেন্সিয়াল।
তো সেন্ট্রালের সিকিওরিটি একজন ট্রেসপাসারকে মেরে দেবে? উইদাউট এনি প্রুফ? মহান্তি এটা জানে?
তাছাড়া মামা, ওই কিশোর বাজোরিয়া লোকটাই বা কে? উইক এন্ডে এসে এখানেই ওঠে কেন? ডক্টর মহান্তির গেস্ট হাউসে থাকে। ওনার ক্লোজ ফ্রেন্ড বলছে।
রাইট।
এই লোকটার নাম আমি কোনওদিন শুনিনি। হি হিস হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিসনেস পার্সন।
তোমার এই প্রজেক্টে জয়েন করতেই বা সে বলছে কেন?
ও বলার কে? ও মহান্তির রিসার্চ সম্পর্কে কী জানে?
ঠিক, ঠিক।
সুতরাং মহান্তির সঙ্গে মিট করা আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি। গেস্ট হাউসে চান-খাওয়া করেই ওর সঙ্গে বসব। চল—

ক্রমশ

ফান্ডা - মেন্টাল

পঞ্চক

বিষয়-পাখি

১) সবচেয়ে দ্রুতগামী পাখি কোনটি?
২) সবচেয়ে উঁচুতে ওড়ে কোন পাখি?
৩) সবচেয়ে বেশি ভ্রমণকারী পাখি কোনটি?
৪) সবচেয়ে বড় পাখি কোনটি?
৫) সবচেয়ে ছোট পাখি কোনটি?

শব্দভেদ

মা, বা, আ, ব — (– –)

[বন্ধনীর মধ্যে শূন্যস্থানে এমন একটি অর্থপূর্ণ শব্দ বসবে যার সঙ্গে বন্ধনীর বাইরের অক্ষরগুলি মিলে আলাদা আলাদা নতুন শব্দ তৈরি করবে।]

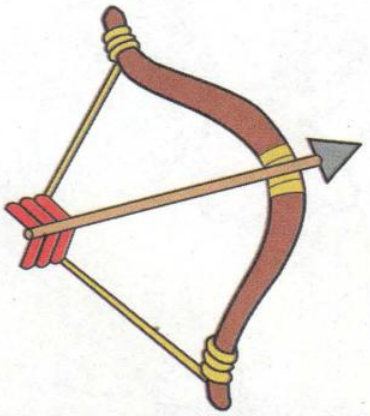

মগজাস্ত্র

বিখ্যাত অঙ্কবিদ ডিয়োফ্যান্টাস-এর কবরের শিলালিপিতে এইরকম লেখা আছে—

পথিক! এইখানে ডিয়োফ্যান্টাস -এর নশ্বর দেহ শায়িত আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে তাঁর আয়ু সংখ্যার দ্বারা নির্ণয় করা যায়। তাঁর জীবনের এক ষষ্ঠাংশ ছিল তাঁর শৈশব। এরপর তাঁর জীবনের এক দ্বাদশাংশ নানাভাবে কাটানোর পর তিনি বিবাহ করেন। বিবাহের পর জীবনের এক সপ্তমাংশ কেটে যাওয়ার পরও তাঁর কোনও সন্তান হয়নি। আরও পাঁচ বছর পর তিনি তাঁর প্রথম সন্তানের মুখ দেখেন। তাঁর জীবনের মাত্র অর্ধেককাল সময় তিনি সেই পুত্রের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তারপরেই পুত্রটি মারা যায়। পুত্র মারা যাবার পর ভগ্নহৃদয় ডিয়োফ্যান্টাস আর মাত্র চার বছর বেঁচেছিলেন।

আরে না-না, মারা যাবার সময় ডিয়োফ্যান্টাস-এর কত বয়স হয়েছিল—এই ধরনের বাজে প্রশ্ন করে তোমাদের বিব্রত করব না। তোমরা বরং সহজ প্রশ্নটারই উত্তর দাও—ডিয়োফ্যান্টাস-এর ছেলে কত বছর বয়সে মারা গিয়েছিল? তখন ডিয়োফ্যান্টাস-এর বয়স-ই বা কত ছিল?

ফা ন্ডা - মে ন্টা ল

শ ব্দ বা ণ

১		২	■	৩			৪
	■	৫	৬		■	■	
৭	৮	■		■	৯	১০	
১১				■	■		■
■		■	■	১২			১৩
১৪			■		■	১৫	
	■	■	১৬		১৭		
১৮				■	১৯		

সব সমাধান যুক্তাক্ষর এবং আ-কার, ই-কার ইত্যাদি বর্জিত।

পাশাপাশি ঃ ১) বলের মতো সে এক ফুল। ৩) —হারিয়ে নবাব চিন্তাকুল। ৫) আত্মজ সে পাত্র স্নেহের, ৭) জলদস্যু সব আরাকানের। ৯) এসেছে আদালতের ডাক— ১১) 'মিষ্টি' একটা খাব না, থাক। ১২) কেন করো কাজ অন্য নামেতে? ১৪) 'যাত্রা' আজিকে কোন সে দূরেতে? ১৫) বুদ্ধিতে যা তুমি, বাহুতেও তাই, ১৬) কথাটা মানতে 'আপত্তি' নাই। ১৮) আগুন লেগেছে জানায় যেখানে, ১৯) সাদা-সিধে লোক চলনে বলনে।

ওপর-নীচ ঃ ১) এই ভাবেতে চিবিয়ে খায়, ২) তোমার কথায় দিলাম সায়। ৩) দানব-রে পাই মহাভারতে, ৪) 'রোধে' বিদ্রোহ শক্ত হাতেতে। ৬) কোমল কহে এমন মন, ৮) গভীর আওয়াজ, মন দিয়ে শোন। ১০) 'উদ্দেশ্য' যাহারে কয়— ১২) পানের চাষ যেখানে হয়। ১৩) বস্ত্র সে অতি পাতলা কাপড় ১৪) 'ভুল'টি করে গালে মারে চড়। ১৬) মাটির নীচে জন্মে তাহারা লম্বা কেহ বা গোল, ১৭) রবি ঠাকুরের সমান সৃষ্টি, দ্বারিক বাজান ঢোল।

প্রমাণ করো, দেখি

মানা = ৩৬ ইঞ্চি

হেঁয়ালি

নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে?
কহেন কবি কালিদাস, পথে যেতে যেতে।

(সংগৃহীত)

পরিচালক সোমনাথ রায়

অবিশ্বাস্য! আশ্চর্য

বৈভব পাণ্ডে

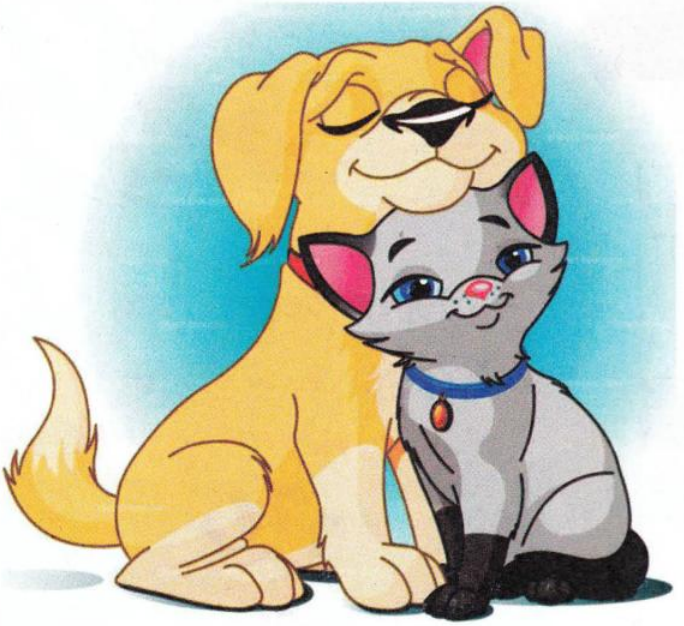

টাক মাথার দাম

আমেরিকার লুইসিয়ানা রাজ্যে একটা মজার আইন আছে যা টাক মাথা লোকদের শুনলে খুব ভালো লাগবে। সেখানে আইন করে টেকো লোকদের চুল কাটার জন্য সেলুনে দাম বেধে দেওয়া আছে। কোনও সেলুন মালিক যদি ২৫ সেন্ট-এর বেশি দাম নেয় টাক মাথা লোকের চুল কাটতে, তা হলে তার নিশ্চিত জেল হবে।

কুকুর-বেড়ালের সদভাব

নর্থ ক্যারোলিনাতে যাদের বাড়িতে কুকুর-বেড়াল আছে, তারা সদাই ভয়ে ভয়ে থাকেন, পাছে তাদের পশুরা ঝগড়া করে পাড়া মাথায় করে। ছোটবেলা থেকেই কুকুর-বেড়ালের পিছনে যথেষ্ট পরিশ্রম করে তাদের বন্ধুত্ব করানো হয়। এমনকী পড়শির বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাদের কুকুর-বেড়ালগুলির সঙ্গে ভাব করানো হয়। সেখানকার আইন বলে যে যদি কোনও কুকুর-বেড়াল ঝগড়া করে তাহলে মালিকের দণ্ডনীয় সাজা পেতে হবে।

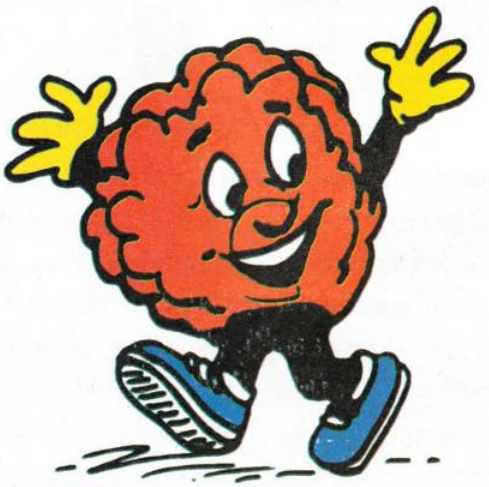

রবিবার বাঁধাকপির ছুটি

নিউ জার্সি শহরে যাদের আত্মীয়রা থাকেন, তাদের জিগ্যেস করতে পারো যে রবিবার দিন বাড়িতে বাঁধাকপি রান্না হয় কিনা। আর হলে সেটা কবে বাজার থেকে কেনা হয়। ওই শহরের আইন অনুসারে, রবিবার বাঁধাকপি পাওয়া যায় না বাজারে। কারণটা জানা যায়নি।

ল্যাজে আলো

কলোরাডো তো আবার আরও এগিয়ে, সেখানে বেড়াল পুষলে তার পিছনে নজর রাখতে হয় যাতে সে হারিয়ে না যায়। বেড়াল হারালে যদি পুলিশ তা খুঁজে পায় তাহলে নির্ঘাত জেল হবে মালিকের। আইন অনুযায়ী, সন্ধে হলেই বেড়ালের ল্যাজে আলো জ্বালিয়ে বেঁধে দিতে হবে। যাতে দূর থেকে আলো অনুসরণ করে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়।

মিয়াও কোরো না

কক্ষনো যদি ফ্লোরিডার মিয়ামি সমুদ্র তটে বেড়াতে যাও, ভুলেও যেন কুকুর বা বেড়ালের ডাক নকল করতে যেও না। করলেই নির্ঘাত পুলিশ তেড়ে এসে হাতকড়া পরাবে। ওই জায়গাকার আইন অনুযায়ী, কোনও জন্তুর ডাক নকল করা মানে সেই জন্তুকে এবং চারপাশের মানুষকে অপমান করা। এটা দণ্ডনীয় অপরাধ।

অভিষেক দে

স্বপ্ন দেখাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া

ইতিহাসটা বদলাতে পারল না পাকিস্তান। ৯০-এর দশক থেকে বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে হারের যে ট্র্যাডিশন শুরু হয়েছিল, সেই ধারা অব্যাহত থাকল। জাভেদ মিয়াদাদ বা ওয়াকার ইউনিসদের ম্যাচের আগের হুংকার ম্যাচ-পরবর্তী সময়ে পরিণত হল ব্যক্তিগত আক্রমণ আর পারস্পরিক দোষারোপের পালায়। পাকিস্তানের অধিনায়ক পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'পাকিস্তানের হয়ে খেলেছে ১১ জন আর ভারতের হয়ে খেলেছে জোটবদ্ধ একটা দল।'

হক কথা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আমলে যে টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্ট চালু হয়েছিল, শচীন-পরবর্তী সময়েও তা অক্ষুণ্ণ থেকেছে। তাই পাকিস্তান না পারলেও, নতুন করে ইতিহাস লিখল ধোনির ভারত—বিশ্বকাপে প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে।

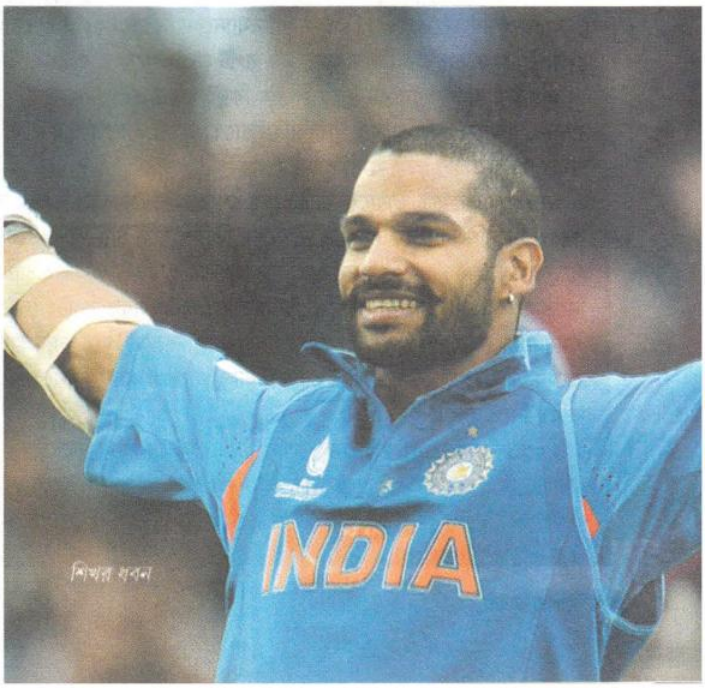

দক্ষিণ আফ্রিকা—২০১৫ বিশ্বকাপের অন্যতম দাবিদার। তাদেরকে শুধু হারানোই নয়, একেবারে যাকে বলে দুরমুশ করা। পাশাপাশি রাখতে পারি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়ার জয়। শুধু জয় নয়, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটিশদের একেবারে বুলডোজ করেছে স্টিভ স্মিথরা। চলতি বিশ্বকাপে ভারতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হতে যাচ্ছে টিম অস্ট্রেলিয়া।

ভারত ও অস্ট্রেলিয়া—দুটো টিমের মধ্যেই রয়েছে না-ছোড় মানসিকতা। স্কোর বোর্ডে ৩০০-র ওপর রান থাকলেও বোলাররা কৃপণ থেকে কৃপণতম বোলিং করেছে।

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় বোলারদের কথা বলতেই হয়। বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় বোলিং নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। উপরন্তু, ইশান্ত শর্মা চোটের জন্য ছিটকে যাওয়ায় ভারতীয় বোলিং অ্যাটাককে দুর্বলতম বলা হচ্ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইশান্তের না থাকাটা এক অর্থে সাপে বর হয়েছে। যেভাবে মোহিত উঠে এসেছে, তা এক কথায় অনবদ্য।

মহম্মদ শামির কথা আলাদা করে বলতে হয়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শর্ট বল করে যেভাবে ও ইউনিস খানকে আউট করল, সেটা অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকা এক সময় উপমহাদেশের বাউন্স-ভীরু ব্যাটসম্যানদের ওপর প্রয়োগ করত।

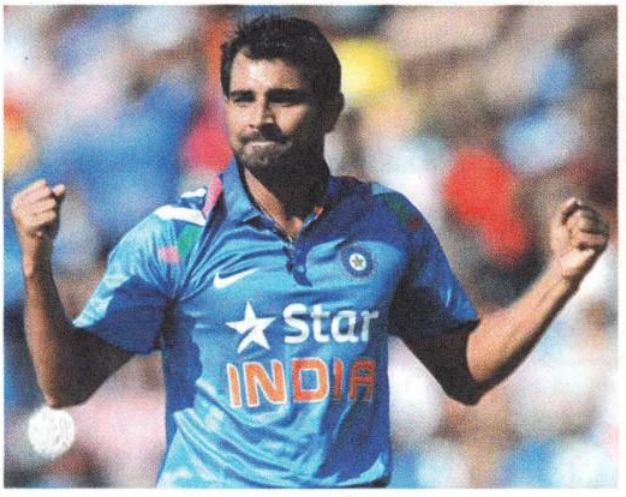

মহম্মদ শামি

অশ্বিন আর জাদেজাও প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের ক্রিজে থিতু হতে দেয়নি। পেস-ট্র্যাকেও ভারতীয় স্পিনারদের এই দাপট প্রতিপক্ষকে ভাবাচ্ছে।

ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের নিয়ে বিশেষ কিছুই বলার নেই। কোহলি, ধবন, রায়না, রাহানে—প্রত্যেকেই ধারাবাহিকভাবে ভালো ব্যাট করছে। রোহিত শর্মার জ্বলে ওঠাটা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

ভারতকে একমাত্র ভাবাচ্ছে ব্যাটিং-এর শেষের পাঁচ ওভার। ভালো স্টার্ট করেও ফিনিশিংটা ঠিকঠাক হচ্ছে না। শেষ তিরিশ বলে চার-পাঁচটা উইকেট পড়ে যাচ্ছে, অথচ রানও তেমন হচ্ছে না। জাদেজা আর ধোনিকে এই দায়িত্বটা নিতে হবে। কারণ, ধোনি প্রতিদিন টস জিতবে আর ভারত ব্যাটিং নেবে—এমনটা নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে বড় রান তাড়া করতে গিয়ে ভারতের টপ অর্ডার যদি দ্রুত আউট হয়ে যায়, তাহলে ধোনি, জাদেজা আর অশ্বিনকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।

২০১১-র বিশ্বকাপ ফাইনালে ধোনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল ম্যাচ জেতানোর ভার। তাই এবারও তাঁকে উদ্দেশ্য করে আওয়াজ উঠছে—'উই ওন্ট গিভ ইট ব্যাক'। বিশ্বকাপ ধরে রাখতে তাই মরিয়া ধোনির ছেলেরা। তবে বড় কাঁটা অস্ট্রেলিয়া।

SUBSCRIPTION FORM

কিশোর ভারতী

উলটে নয়, পালটে গেছে

এখন আগাগোড়া রঙিন! ঝকঝকে!

আসুন! একবার চেখে দেখুন।

গ্রাহক মূল্য

কিশোর ভারতী-র ৯টি সাধারণ সংখ্যা (১৫ টাকা), ২টি বিশেষ সংখ্যা (৩০ টাকা) ও ১টি শারদীয়া সংখ্যা (১১০ টাকা)-সহ মোট ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

সাধারণ ডাকে গ্রাহক মূল্য

1 year Rs. 300.00 3 years Rs. 900.00

* কিশোর ভারতীর ২টি বিশেষ সংখ্যা এবং শারদীয়া সংখ্যা সাধারণ ডাকের গ্রাহকদের কাছেও ক্যারিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

* সাধারণ ডাকের গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যা ব্যতীত অন্যান্য সংখ্যা অর্ডিনারি পোস্টে পাঠানো হয়। ডাকের গোলমালে পত্রিকা খোয়া গেলে বা দেরিতে পেলে তার দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

ক্যারিয়ারে গ্রাহক মূল্য

কলকাতা	1 year Rs. 350.00	3 years Rs. 1050.00
পশ্চিমবঙ্গ	1 year Rs. 450.00	3 years Rs. 1350.00
ভারত	1 year Rs. 600.00	3 years Rs. 1800.00

হাতে হাতে গ্রাহক মূল্য

1 year Rs. 225.00 3 years Rs. 625.00

BANK DETAILS

Company Name : PATRA BHARATI,
Bank Name : AXIS BANK LTD., Branch : Central Avenue, Kolkata (WB), 31A & B, Tara Chand Dutt Street, Kolkata 700073, Current A/c No 910020047136605, IFS Code UTIB0000870, MICR Code 700211048

To subscribe the magazine fill the form in Block Letter and mail along with Demand Draft, at par Cheque in favour of PATRA BHARATI payable at Kolkata

☐ New ☐ Renew

SUBSCRIBE NOW!

Name .....

Mailing Adress .....

.....

Pin ..... Contact .....

e-mail .....

Techno India Group's tribute to the Ideals steering the nation

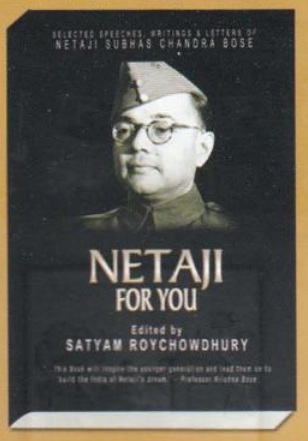

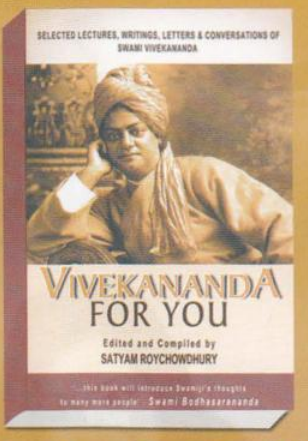

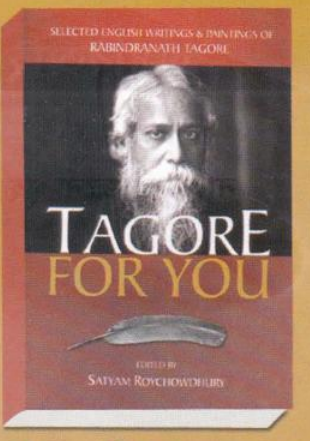

Compiled & Edited by **Satyam Roychowdhury**

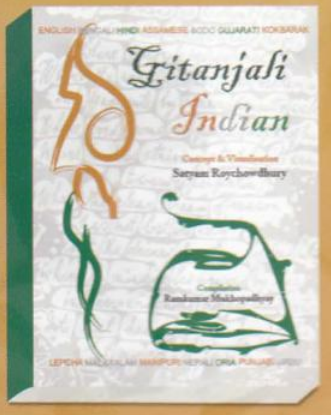

GITANJALI INDIAN

In 14 Indian Languages

Concept & Visualisation
Satyam Roychowdhury

সত্যম
রায়চৌধুরীর
অন্যান্য বই

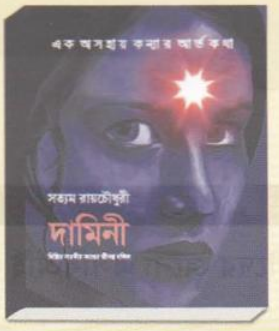

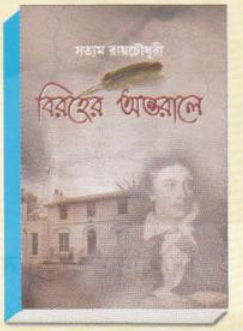

Marketed by

PATRA BHARATI

TECHNO INDIA GROUP
HARNESSING TECHNOLOGY, ENRICHING LIVES

Available in all leading book stores

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
প্রত্যেক ভারতবাসীর ব্যাঙ্কার

এসবিআই

HER ঘর
নারীদের জন্যে গৃহ ঋণ

গৃহ ঋণ তাঁদের জন্যে
যাঁরা গড়ে তোলে ঘর।

শর্তাবলী প্রযোজ্য

নিবেদিত হলো **নারীদের জন্যে এসবিআই হোম লোন** @ কম করা সুদের হারে।

সব থেকে কম সুদের হার
10.10% বার্ষিক

সব থেকে কম ইএমআই
₹ 885/ প্রতি লাখ #

30 বছরের সময়কালের জন্যে।

- দৈনিক কমে যাওয়া ব্যালেন্সের ওপর সুদ
- ম্যাক্সগেইন : ওভারড্রাফ্টের সুবিধা

ঋণের অর্থরাশি	ইএমআই /লাখ #
₹ 75 লাখ পর্যন্ত	₹ 885
₹ 75 লাখের বেশী	₹ 897

অন্যদের জন্যে বার্ষিক @ 10.15% সুদের হার

সহায়তার জন্যে কল্ করুন আমাদের 24X7 হেল্পলাইন নম্বরে 080-26599990 বা টোল-ফ্রী নম্বরে 1800 11 2211 / 1800 425 3800
বা লগ অন করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in